দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

অর্থনীতিকে দিশাহীন করে দিতেই ভারতে জালনোট ঢোকাচ্ছে পাকিস্তান

— পৃ: ২৯

জয় হবে বিহারবাসীর

— পৃ: ৩১

৬৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা ।। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ।। ১০ আশ্বিন - ১৪২২ ।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১০ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৮ সেপ্টেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

নেতাজীর স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয় থেকে মুছে দিতে নেহরু ও কংগ্রেস মরিয়া চেষ্টা করেছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : ক্ষমতা যার, আইন তার— এটাই তো স্বাভাবিক ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

হার্দিক প্যাটেলের আন্দোলন নিয়ে জাতীয় বিতর্ক হোক ▯ তারক সাহা ▯ ১২

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণেই সামাজিক অবক্ষয় ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৪

নাগরিক নিঃস্পৃহতাই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১৬

চীনের প্রাচীন হিন্দু মন্দির ▯ ডা: রবীন্দ্রনাথ দাশ ▯ ২১

একটি পারিবারিক মিলন ▯ রাম মাধব ▯ ২৭

অর্থনীতিকে দিশাহীন করে দিতেই ভারতে জালনোট ঢোকাচ্ছে পাকিস্তান ভায়া বাংলাদেশ ▯ বাসুদেব পাল ▯ ২৯

জয় হবে বিহারবাসীর ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা - ২০১৫

ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

প্রকাশিত হবে ৬ অক্টোবর ২০১৫

মূল্য : ৭০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল : সত্যমেব জয়তে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেতাজী সংক্রান্ত ৬৪টি গোপন ফাইল প্রকাশ করিয়াছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে কেন্দ্র সরকারের তরফে সাধুবাদ জানানো হইয়াছে। রাজনৈতিক মহলের কেউ কেউ অবশ্য এই ফাইলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কংগ্রেস স্বাগত জানাইলেও যথেষ্ট চাপের মুখে রহিয়াছে। কেননা নেহরু পরিবারের তরফে নেতাজী পরিবারের উপর গোয়েন্দাগিরি করা হইত বলিয়া যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে দিল্লীর মতো প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারাও মুখে কুলুপ আঁটিয়া বসিয়া আছেন। কেউ কেউ আবার ফাইল অসম্পূর্ণ বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন। যেমন একটি ফাইলে শুধুমাত্র প্রথম পাতাটিই রহিয়াছে। যে সময়ের ফাইল হইতে পাতা নিখোঁজ হইয়াছে সময়ের হিসাবে তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি হেফাজতে যেসব তথ্যসমৃদ্ধ ফাইল ছিল সেইগুলি কেন এতদিন অবরুদ্ধ ছিল তাহার কারণ খুব স্পষ্ট। কংগ্রেস ব্যতীত এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিয়াছে কংগ্রেসি লেজুড় দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা। এই কংগ্রেস ও তাহার চিরকালের লেজুড় কমিউনিস্টরা একসময় একসঙ্গে সোচ্চার হইয়াছিল 'তোজোর কুকুর নেতাজী প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে।'

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়, সত্য স্বপ্রকাশ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহার প্রকাশ হয় ধীরে ধীরে। দেশের মানুষের দাবিতে ইতিমধ্যেই নেতাজীর মৃত্যুরহস্যর মীমাংসার উদ্দেশ্যে দুইটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং দুইটি কমিশনের রিপোর্টও ভারত সরকার কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোনো সন্দেহের নিরসন হয় নাই। সঙ্গত কারণেই মনে হয় 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। কথায় বলে, অতি-চালাকের গলায় দড়ি। সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করিবে। কিন্তু সরকারি ফাইলে যে তথ্য আছে তাহা গোপন বলিয়া সরকারি কমিশনকে দেখিতে দিবে না। ইহা শয়তানি ছাড়া আর কী! শুধু তাহাই নহে, সরকারের বিদেশমন্ত্রী বিদেশি সরকারকেই দূত মারফত নির্দেশ পাঠাইয়া থাকে যে ভারতের সরকারি তদন্তকারী দলকে যেন লেখ্যাগারের কোনো তথ্য দেখিবার সুযোগ দেওয়া না হয়।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সত্যের প্রকাশ হইতে থাকে। তৃতীয়বারের কমিশন প্রধান, বিচারপতি মনোজ মুখার্জি ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অসহযোগিতা সত্ত্বেও নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, জাপানের তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী চিতাভস্মের সংরক্ষণ একটি গল্পকথা মাত্র। তবে আশার কথা, রুশ ভাষায় পারদর্শী নেতাজী গবেষক ড. পূরবী রায় তাঁহার গ্রন্থে যে রাশিয়ার কেজেবি আর্কাইভে নেতাজী প্রসঙ্গের উপস্থিতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা খুবই ইঙ্গিতবহ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু জানাইয়াছেন যে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্কের কী প্রভাব পড়িবে তাহা খতাইয়া দেখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল প্রকাশ করিবে। উল্লেখ্য, নেতাজী সংক্রান্ত ১৩৫টি 'ক্রিটিক্যাল ফাইল' কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। ইতিমধ্যে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই জানাইয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র বসু-পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করিবেন। ইতিপূর্বেও তিনি স্বয়ং কলকাতায় আসিয়া বলিয়াছিলেন এই রহস্যের উদঘাটন কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় কর্তব্য। সুতরাং সত্যের স্বার্থেই কেন্দ্র সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এই নথিগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে এমনটাই আশা করা যায়।

সুভাষিতম্

নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবন্তু লক্ষ্মীঃ সমাগচ্ছতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব অস্তু মরণং বা যুগান্তরে বা ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।। (ভর্তৃহরিঃ নীতিশতক)

নীতিবাগীশরা নিন্দা বা প্রশংসা করুক, ধনসম্পত্তি আসুক বা চলে যাক, মৃত্যু এখনই কিংবা যুগান্তরেই আসুক, ন্যায়ের পথ থেকে ধৈর্যবান ব্যক্তিরা বিচলিত হন না।

নেতাজীর আই এন এ-র সঞ্চিত বিপুল অর্থভাণ্ডারের হদিশ পেতে বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬৪টি নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল 'ডি ক্লাসিফাই' করে প্রকাশ্যে আনার পর বহু আলোচিত ভারতীয় বীর নেতাজী সংক্রান্ত আরও নানান রহস্যঘন বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নেতাজী পরিবারের সদস্যরা ইতিমধ্যে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন— আই এন এর-র অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা পয়সা কোথায় গেল?

নেতাজীর নাতি চন্দ্র বোসের বয়ান অনুযায়ী নেতাজীর তথাকথিত ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্টে নিখোঁজ হওয়ার পর এই সমস্ত টাকা জওহরলাল নেহরুর হেফাজতে যায়। এছাড়া আই এন এ-র আরও দুই সদস্য ওই সঞ্চিত অর্থের আংশিক অপব্যবহারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি বলেন, এদের মধ্যে একজনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। পরবর্তীকালে নেহরুর সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত হয়েছিলেন।

যুদ্ধ মিটে যাওয়ায় ও নেতাজীর উপস্থিতি না থাকায় একমাত্র নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই এই সম্পদের গরিষ্ঠাংশের জিম্মাদার হয়। তিনি আরও জানান, আই এন এ-র অন্দরে আরও দুই কুলাঙ্গার রয়েছেন যাঁরা এই টাকার অংশবিশেষ তাদের হেফাজতে থাকা অবস্থায় অপব্যবহার করেছিলেন। তাই এই মর্মে অর্থাৎ আই এন এ-র তহবিলের যথাযথ উদ্ধারের জন্য তিনি একটি পৃথক তদন্তের আবেদন জানান।

চন্দ্র বোসের এই বিস্ফোরক দাবি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পড়ে থাকা এমন একটি ফাইলের সন্ধান পাওয়া গেছে (File No. 2 (67)/ 56-71 (PM) যেখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় একটি ট্রাস্ট-এর উল্লেখ রয়েছে। যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির। শুরুতে আই এন এ-র ২ লক্ষ টাকা নিয়ে এই ট্রাস্টের জন্ম হয়। জওহরলাল নেহরু ও তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ড. বিধানচন্দ্র রায় এই 'ট্রাস্ট ডিড'-এ স্বাক্ষর করেছিলেন বলে প্রকাশ। এই বিষয়ে বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ড. পূরবী রায় ও অন্য বিশেষজ্ঞরা সহমত হয়ে জানাচ্ছেন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এই মর্মে নেহরুর একাধিক চিঠিপত্র পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, আই এন এ-র তরফে ভারতে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ঘোষিত অর্থের চেয়ে আরও বহু গুণ বেশি। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের ২৭ নং সিমেট্রী রোডের তৎকালীন বাসিন্দা ভি কে সি রামলিঙ্গম নাদার একটা সময় আই এন এ-র এই বিপুল অর্থের হদিশ করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুম্বইয়ের প্রধান কার্যালয় অবধি পৌঁছন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আর বি আই তাঁকে কোনো উত্তর দেয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আবার ওঠে আসে রাজীব গান্ধীর আমলে ১৯৮৭ সালে। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র অনুযায়ী তৎকালীন জাপান, মায়ানমার ও সিঙ্গাপুর সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে ৪৮ কোটি টাকা পাঠায়। তখনই এই অর্থ দিয়ে নতুন দিল্লীতে একটি নেতাজী মেমোরিয়াল নির্মাণের প্রসঙ্গ ওঠে। সিপিএমের দীর্ঘদিনের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে ১১ জুন ১৯৮৭ সালে রাজীব গান্ধীকে একটি চিঠি দেন। ওই চিঠিতে তিনি আই এন এ-র অর্থ দেশে ফিরে আসাকেও একই সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, মোটামুটি হিসেবে সুদ সমেত সেই অর্থের পরিমাণ ১১৪ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এই ঘটনার আগে ১১৮৬ সালে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী IB enquiry report 1986 (File No. 2 (64)/86 (PM) জাপান সরকারের তরফে তদানীন্তন ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেনস্ লীগ-এর সঙ্গে লেনদেন বাবদ এক বিপুল অঙ্কের টাকা ভারত সরকারকে পাঠানো হয়।

আই এন এ-র ঝাঁসী বাহিনীর সদস্যা বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতাবাসী শ্রীমতী অরুণা চ্যাটার্জী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে কিছু অতীত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী একবার রেঙ্গুনে দাঁড়ি পাল্লায় একদিকে নেতাজীকে রেখে অন্যদিকে বিপুল স্বর্ণালঙ্কার বোঝাই করে ওজন করা হয়। তাঁর প্রশ্ন, এই অগাধ সোনা-দানা কোথায় গেল? তিনি বলেন, অবশ্যই আই এন এ-র তরফে যুদ্ধ চালানোর খরচ বাবদ এর কিছু অংশ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু এর পরও একটা বড় অংশ ভারতে পাঠানো হয়েছিল। আজ দেশবাসীর সঙ্গে তিনিও জানতে চান সেই ধনসম্পদ বর্তমানে কার হেফাজতে রয়েছে। দেশের সরকারকে অনুসন্ধান করে এর জবাব দিতেই হবে।

ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের বিপুল বৃদ্ধি মোদীর হাত শক্ত করল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নতুন দিল্লীর সংবাদসূত্র অনুযায়ী ভারতে আমেরিকার সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ গত জুন, ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫-এর (সঠিক অর্থে মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর) সময়সীমায় ২.২ বিলিয়ন ইউ এস ডলার স্পর্শ করেছে। এই বিনিয়োগ অভূতপূর্বভাবে ২০১১-২০১৪ এই তিনটি আর্থিক বর্ষের সম্মিলিত বিনিয়োগ ২.৪ বিলিয়নকে মাত্র এক বছরেই ছাপিয়ে গেছে। আসন্ন আমেরিকা সফরের মাধ্যমে দেশে মার্কিন পুঁজির বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান যে মোদীকে তাঁর কার্যসিদ্ধিতে যথেষ্ট উজ্জীবিত করবে একথা নিশ্চিত।

প্রসঙ্গত নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ার তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির সিইও-দের (চিফ একজিকিউটিভ অফিসারদের) সামনে তাদের দেশেরই শিল্প সংস্থাগুলির ভারতে বিনিয়োগের এই বৃদ্ধি অত্যন্ত সদর্থক ভাবেই উপস্থাপিত করা যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। যদিও দেশের সংসদে সরকার কংগ্রেসের নেতিবাচক রাজনীতির কারণে জমি বিল নিয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, সেই সঙ্গে জি এস টি বিলও ঝুলে রয়েছে। তথাপি আমেরিকান বিনিয়োগের এই চমকপ্রদ বৃদ্ধি মোদীকে ভারতে উৎপাদন শিল্প ক্ষেত্র ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বাড়তি বিনিয়োগ টানতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ রেটিং সংস্থা টাইমস ও ফরচুন শিল্পের তরফ থেকে ফরচুন ৫০০ কোম্পানির মধ্যে থেকে বাছাই ৫০টি শিল্প সংস্থার মুখ্য আধিকারিকদের নিয়ে মোদীর সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছে। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য এই সাক্ষাৎকারের মূল উপজীব্য ভারতে বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারকে সে দেশের শিল্পমহল এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছে যে অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমেরিকান আহ্বায়ক গোষ্ঠী ও শিল্পসংক্রান্ত দপ্তরের নীতি নির্ধারক কমিটি যুগ্মভাবে এই সাক্ষাৎকার পরিচালনা করবে। এদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য দপ্তরকেও।

এই লেখা প্রকাশের সময় ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বরে ১৭টি প্রখ্যাত আমেরিকান কোটি টাকা বিনিয়োগের কারখানায় এরা ২০১৬ থেকে উৎপাদন শুরু করবে। এখানে ১৫০০ কর্মী নিযুক্ত হবে। মোদীর আসন্ন সফর নিয়ে যখন বিরোধী দলের নেতারা শিশুসুলভ আচরণ করছেন তখন প্রস্তাবিত শিল্পসংস্থাগুলির সভায় বিশ্বখ্যাত জেনারেল

কোম্পানি যথা গুগল (হায়দরাবাদে নিউ ক্যাম্পাসে ১৫০০ কোটি), সিসকো (৬২ বিলিয়ন ডলার কর্মী প্রশিক্ষণ ও বিস্তার কাজে), মাইক্রোসফট (তিনটি ডাটা সেন্টার তৈরির ক্ষেত্রে বাড়তি ১৪০০ কোটি), উবের টেকনোলজি (হায়দরাবাদে ৫০ মিলিয়ন ডলার ও দেশের ১৮টি শহরে ব্যবসা বাড়াতে আরও ১ বিলিয়ন ডলার), মার্স (পুনেতে ১৬০ মিলিয়ন ডলারের) কারখানায় বিশ্ববিখ্যাত স্পিকার ও গ্যালাক্সি ব্রান্ড (Snicker ও Galaxy brand)-এর চকোলেট ভারতে তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে চলেছে। এছাড়া হাইল্যান্ড এনার্জি (Hillard Energy) (৫০০ মেগাওয়াট সোলার ও ১৫০ মেগাওয়াট) বায়ু ভিত্তিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। সব চেয়ে বড় প্রকল্প জনসন অ্যান্ড জনসনের। তেলেঙ্গানায় ৪৮ একর জমির ওপর ৪০০০ মোটর-এর তরফে ১২০০০ নতুন চাকরি সৃষ্টিকারী ৬৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হতে চলেছে।

উভয়দেশের শিল্পকর্তাদের পারস্পরিক আলোচনামঞ্চে ভারতের তরফে নেতৃত্ব দেবেন টাটা মোটর সংস্থার সিইও, সাইরাস মিস্ত্রী ও আমেরিকার হোলি ওয়েল-এর তরফে ডেভিড কোট। সিইও-দের আলোচনার পরিণতি সফল করতে সরাসরি কৌশলগত ও বাণিজ্যিক বিশদ বিচারের জন্য নিউ ইয়র্কে হাজির থাকা দুই মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ও সুষমা স্বরাজের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে খবর। আমেরিকার তরফে যেখানে থাকবেন জন কেরি ও প্রিটজ্কার (Pritzker)। ভারতের শিল্পমহলে এই ঘটনা পরম্পরা বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

গো-পাচার রুখতে উদ্যোগী বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বকরিদ-কে কেন্দ্র করে গো-পাচার বন্ধে উদ্যোগী হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের গো-উন্নয়ন শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, গত ৫ বছরে অন্তত ৫০০০ এরকম ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিজেপি কর্মীরা গো-হত্যা বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছেন। সংগঠনের গো-উন্নয়ন শাখার আহ্বায়ক সুব্রত গুপ্তের দাবি : 'আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রয়োজনে রাজ্য জুড়ে পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গো-পাচার রুখবে। আমরা মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি খুঁটিয়ে দেখেছি এবং তাতে গো-জবাই করতে হবে এমন উল্লেখ কোথাও নেই। অন্যদিকে হিন্দুদের শ্রদ্ধার জায়গায় গোরু রয়েছে এবং তাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।' বিজেপি সূত্রের খবর, গো-পাচারের খবর ইতিপূর্বে রাজ্যের যেখান যেখান থেকে এসেছে, বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমানা থেকে সেখানেই এবার তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নজরদারির জন্য পাঠানো হচ্ছে। যেখানেই অনিয়ম চোখে পড়বে, সেখানেই এফ আই আর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কর্মীদের। পরে বিষয়টি আদালতেও গড়াবে বলে দলের তরফে খবর।

বিজেপি-র গো-উন্নয়ন শাখা গো-পাচার বন্ধে দলকে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন গ্রুপ বা আর এ জি গঠন করেছিল গত আগস্ট মাসে। সচেতনতা বাড়াতে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় 'গো-রক্ষা অভিযান র‍্যালি'রও আয়োজন করে তারা। পাশাপাশি এনিয়ে জনমত তৈরিরও তারা চেষ্টা করছেন। দলের বক্তব্য যে গো-পাচার বন্ধে সামিল হওয়া ঠিক আছে। কিন্তু এনিয়ে জনমত তৈরিও একটা বড়ো ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের একটা বড়ো অংশই গো-হত্যার সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। পার্টির বক্তব্য যে তাঁরা জানেন বিষয়টি স্রেফ নির্বাচনী ইস্যু নয়।

অন্য একটি সামাজিক সংগঠনের তরফেও পুজোর সময় অর্থাৎ ১৯ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত গো-হত্যা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে আর্জি জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে হিন্দুদের এই সচেতনতা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে মুসলমান ভোট-লোলুপ তৃণমূল নেতৃত্বের। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিকে তারা পত্রপাঠ নাকচ করতে পারলেই বাঁচে। একে 'শাসক দলের ঔদ্ধত্য' এবং 'আইনের প্রতি অসম্মান' হিসেবেই দেখছে বিজেপি। তাদের বক্তব্য— পশ্চিমবঙ্গের আইন- শৃঙ্খলা দেশের সর্বোচ্চ আদলতের নির্দেশের বাইরে নয়।

বিজেপি-র প্রতিশ্রুতি, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করবে তারা।

গোদাবরী-কৃষ্ণার সংযুক্তিকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অন্ধ্র প্রদেশের রায়লসীমা অঞ্চলে পানীয় জল ও সেচ সমস্যার সমাধানকল্পে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন সফলভাবে হলো। নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে গৃহীত হলেও ইউপিএ আমলে তা কার্যকর হয়নি। এবার অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু সরকারের প্রচেষ্টায় সেই কৃষ্ণা-গোদাবরী সংযোগ সফল হলো। সাধারণত গোদাবরীর ৩০০০ টিএমসি জল বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এর মধ্যে ৮০ টিএমসি জল পোলাভারম রাইট খালের মধ্য দিয়ে পাত্তিসীমা লিফট হয়ে বিজয়ওয়াড়ার ইব্রাহিমপত্তম্ ফেরির কাছে কৃষ্ণা নদীতে পড়বে। ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাত্তিসীমা প্রোজেক্ট মূল ভারতীয় পরিকল্পনা কেন-বেতোয়া নদী সংযোগের অন্তর্গত ছিল না যেটি এবছর ডিসেম্বর মাসে শুরু হবে। তবে ভারতবর্ষে নদী সংযোগের কাজ এই প্রথম নয়। দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে নদী সংযোগের বিভিন্ন প্রকল্প চলে আসছে। ভারতের মাটিতে প্রথম নদী সংযোগের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় ১৮৯০ সালে। দক্ষিণের তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে পেনার নদী পর্যন্ত কে সি ক্যানেল (কুন্ডাল টু কুর্নুপ্পা ক্যানেল) নামে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সংযোগ বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে। কেন্দ্রে গত এনডিএ সরকারের আমলেই নদী সংযোগের কথা ঘোষিত হয়েছিল (লোকসভা ২০ নভেম্বর, ২০০২) কিন্তু পরবর্তী দু'টি লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার ক্ষমতাসীন হলে ওই প্রকল্প কংগ্রেসিদের কাছে ত্যাজ্য হয়ে পড়ে।

এত বছর পর আবার পাত্তিসীমা স্কীমের দৌলতে গোদাবরী-কৃষ্ণা, কৃষ্ণা-পেন্নার, তুঙ্গভদ্রা-পেন্নার-এর মধ্যে সংযোগ সাধিত হলো। এই কৃষ্ণা, গন্টুর, প্রকাশম্, কুর্নূল, কাডাপা, অনন্তপুর এবং চিতোর জেলার কয়েক হাজার কৃষক এতে উপকৃত হবে। কৃষ্ণার ১৩ লক্ষ একর ব-দ্বীপ সহ সর্বমোট ১৭ লক্ষ একর সেচের জল পাওয়া যাবে। যার ফলে সারাবছর ধরে দো-ফসলি চাষের সুবিধা হবে। এছাড়াও নদীর এই জল শোধন করে মিটবে পানীয় জলও। পরবর্তী জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে কেন (মধ্যপ্রদেশ) এবং বেতোয়া (উত্তরপ্রদেশ) নদী দুটির সংযুক্তিকরণ। কেন-বেতোয়া সংযুক্তিকরণই ছিল প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা। কিন্তু পরিবর্তিত জাতীয় পরিকল্পনায় গোদাবরী এবং কৃষ্ণা সংযুক্তিকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু-র তৎপরতায়। উল্লেখযোগ্য যে এই প্রকল্পটি (গোদাবরী-কৃষ্ণা সংযুক্তিকরণ) মাত্র আট মাসেই রূপায়িত হয়েছে।

আর্যদের ভারতীয়ত্ব, রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নিয়ে প্রদর্শনী দিল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নতুন দিল্লীতে ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে চলা এক প্রদর্শনী 'জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ'-এর ওপর নির্ভর করে আর্য- অনুপ্রবেশ তত্ত্ব এবং রামায়ণ-মহাভারত যে শুধুই পুরাণ (মিথ)— এই তত্ত্ব খারিজ করে দিল। ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন বেদাস গত ১৭ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি-তে যে 'ঋকবেদ থেকে রোবট যুগ : সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার স্বতন্ত্র প্রদর্শনী'র আয়োজন করে তাতে আর্যদের ভারত-উদ্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি রামায়ণ-মহাভারত-কে ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবেও প্রমাণিত করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে কেন্দ্রীয় তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপালজী, ধ্রুপদ নৃত্যশিল্পী সোনাল মানসিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ড. মহেশ শর্মা ও ড. কৃষ্ণগোপাল প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রদর্শনীতে ৭০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে মেহেরগড়ে দন্ত চিকিৎসাবিদ্যার আদিতম প্রমাণাদিও প্রদর্শিত হয়েছে। অশোকবনে হনুমান যখন সীতাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন যে চন্দ্রগ্রহণ চলছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রে তার প্রমাণও হাজির ওই প্রদর্শনীতে। ঘটনাটি ৫০৬৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ঘটেছিল বলে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা যখন বারো বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাতবাসে গেলেন তখন ৩১৫৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে একটি সূর্য-গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতকে যে পণ্ডিতমন্যরা গালগল্প বলে চালানোর চেষ্টা করেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান সূত্রে তার কাল নিরূপণ করে যেভাবে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণাদি হাজির করানো হয়েছে দিল্লীর ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে তাতে ওই পণ্ডিতমন্যদের মুখে চুনকালি পড়লো বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনকী প্রদর্শনীতে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ৬৩ জন পূর্বসূরী ও ৫৯ জন উত্তরসূরীরও সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের দিল্লী শাখার ডিরেক্টর সরোজ বালার বক্তব্য : 'আমাদের ইতিহাস ১০,০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। মুসলমান ও খৃষ্টানদের অস্তিত্ব তার অনেক পরের ঘটনা। আমরা দেখেছি রামায়ণ-মহাভারতে গ্রহগুলির যে অবস্থান বর্ণিত হয়েছিল আজকের সঙ্গে তার হুবহু মিল। আমরা জিনতন্ত্র অধ্যয়ন করে দেখেছি যে আর্যরা খাঁটি ভারতীয়-ই। সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপালজীর বক্তব্য : 'খৃষ্টান পণ্ডিতরা ভাবতেই পারেন না যে ইতিহাস ৪০০০ বছরের বেশি প্রাচীন হতে পারে। ঋকবেদ থেকে আজকের সময় অবধি যে ইতিহাসের ধারা বজায় থাকতে পারে এটা তাদের কাছে অকল্পনীয়। এমনকী ম্যাক্সমূলারও ৫০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের বেশি যেতে পারেননি।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেশ শর্মা বলেন : 'আধুনিক প্রজন্মের কেউ কেউ বলতেই পারেন রামায়ণ-মহাভারত তাদের শয়নকক্ষে বসে লেখা। তাই এর জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ জোগাড় করা জরুরি ছিল যেটা এই প্রদর্শনীতে করা হয়েছে। সোনাল মানসিংয়ের বক্তব্য : 'ওয়েনডি ডেনিগারের মতো একশ্রেণীর পাশ্চাত্য লেখক ভারতের ইতিহাসকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন। আমাদের উচিত ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন বেদাস-এর লেখা ইতিহাস পড়া। তবেই প্রকৃত সত্য জানতে পারবো।'

নেতাজীর স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয় থেকে মুছে দিতে নেহরু ও কংগ্রেস মরিয়া চেষ্টা করেছে

কলকাতা পুলিশের কব্জায় থাকা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গোপন নথি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী ভক্ত বাঙালির হাততালি কুড়োচ্ছেন। অথচ ব্যাপারটা উলটো হওয়ারই কথা ছিল। জার্মানি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত যে ১৩৫টি ফাইল দিল্লীতে সরকারের কাছে আছে সেগুলি সবই প্রকাশ করা হবে। তারপর কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হলেন। মমতা এর সুযোগ নিলেন। আর মাস ছয় সাতের মধ্যে রাজ্য বিধানসভার ভোট। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর গুজব যে কংগ্রেস এবং সিপিএম ভোটের আগে আসন সমঝোতা করবে। যদি গুজব সত্যি হয় তবে ভোটের ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। এটা ঠেকাতেই ধুরন্ধর চতুর রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী ফাইল প্রকাশ করেছেন। নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত কোনো ফাইল রাজ্য পুলিশের কাছে নেই তা অজানা নয়। প্রকাশিত ফাইলে চমক যেটুকু আছে তা হচ্ছে জওহরলাল নেহরু'র নির্দেশে সত্তরের দশক পর্যন্ত পুলিশ বসু পরিবারের সদস্যদের উপর নজরদারি রেখেছিল। কেন? একথা বোঝা যাচ্ছে যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের না জানিয়েই বসু পরিবারের উপর নজরদারির নির্দেশ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশকে দেন। নেহরুর ভয়টা ছিল কী? নেহরু কি জানতেন যে তাইপেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা যাননি। তাঁর ভয় ছিল বসু পরিবারের সঙ্গে নেতাজীর গোপন যোগাযোগ ছিল। উল্লেখযোগ্য যে বসু পরিবারের সমস্ত সদস্য জোর গলায় প্রচার করেছেন তাইপেইতে ১৯৪৫ সালে ১৮ আগস্ট নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। নেহরুর খবর যদি ভিন্ন হয় তবে তিনি হয়তো এর মধ্যে বসু পরিবারের ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

গূঢ় পুরুষের কলম

ঘটনা যাইহোক না কেন নেহরু যে আমৃত্যু নেতাজী বিরোধী ছিলেন তা এখন পুলিশ ফাইল থেকে প্রমাণিত। মার্কসবাদীরা নাকি ক্ষমতায় থাকাকালে জানতোই না যে রাজ্য পুলিশের কাছে নেতাজী সংক্রান্ত গোপন ফাইল আছে। এই আদ্যন্ত মিথ্যা কথাটা বলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু তো বেজায় চটেছেন। গত ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে বামফ্রন্ট সরকার নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের কথা ভাবেনি কেন প্রশ্ন করাতে বিমানবাবু বেদম চটে ওঠেন। রাজনীতির দাবার এক চালে মমতা সিপিএম এবং কংগ্রেসকে বেআব্রু করে দিয়েছেন।

বলা হচ্ছে যে নেতাজীর অন্তর্ধান সংক্রান্ত গোপন ফাইল কেন্দ্রের কাছে আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস তেমন চাঞ্চল্যকর কোনো ফাইলই এখন নেই। একটা সময়ে ছিল। গত পঞ্চাশের দশকে নেহরুর নির্দেশে নেতাজী সংক্রান্ত সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইলই নষ্ট করে দেওয়া হয়। সাংবাদিক অনুজ ধর তাঁর 'ব্যাক ফ্রম ডেড' বইতে লিখেছেন, ১৯৪৫ সালে জাপান সরকার টোকিওতে নেতাজীর চিতাভস্ম ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ভারতীয় দূতাবাসের কর্তাদের হাতে তুলে দেন। সবই তাঁরা দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। নেহরুই তখন দেশের বিদেশমন্ত্রীও ছিলেন। যদি ১৯৫৪ সালে নেতাজীর চিতাভস্ম ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে থাকে তবে রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্মটি কোন প্রাণীর? নেতাজীর স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয় থেকে মুছে দিতে নেহরু এবং কংগ্রেস মরিয়া চেষ্টা করেছে। তার প্রমাণ, ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে সংসদে নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসে'স ডেথ ইজ সেটলড্ বিয়ন্ড ডাউট"। জবাবে বিরোধী দলনেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, "দ্য প্রাইম মিনিস্টার নেহরু ইজ ইন দ্য হ্যাবিট অব প্রিজাজিং ইস্যুস"। হায়! অটলজীও প্রধানমন্ত্রী হয়ে নেতাজী ফাইল প্রকাশে অনীহা দেখান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ক্ষমতা যার, আইন তার— এটাই তো স্বাভাবিক

মাননীয় পাঠক/ পাঠিকা,

নিয়ম মানুন। মেনে বাঁচতে শিখুন। আজকাল বিরোধীরা শাসকদলের বিরুদ্ধে একটা মহা অভিযোগ তুলছে। বলছে, শাসকদলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকলে সাত খুন মাফ, আর বিরোধী হলে বিনা দোষেও শাস্তির খাঁড়া। বলছে তৃণমূল আমলে এমন সর্বনেশে আইনই দস্তুর হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এমন অভিযোগ তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়।

তিনি বলেছেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে এখন দু’ধরনের আইন। ইংরেজ আমলে ইংরেজদের জন্য এক রকম, আমাদের জন্য এক রকম আইন ছিল। এখন তৃণমূল যারা করে তাদের জন্য এক রকম, বাকিদের জন্য অন্য রকম! তৃণমূলের লোকেদের জন্য সব সময় জামিনযোগ্য ধারা, আর অন্যদের জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া যায়। দরকারে সরকারি আইনজীবী গরহাজির থাকতে পারেন, মুখও বন্ধ রাখতে পারেন।’’

আমার কথা হচ্ছে— ক্ষমতা যার, আইন তার— এটাই তো স্বাভাবিক! বাম আমলেও তাই ছিল এ রাজ্যে। আর আমাদের দিদি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সিপিএমের ছাত্রী। বিরোধী নেতারা বলছেন, তৃণমূল জমানায় পুলিশ-প্রশাসন তুচ্ছ ঘটনাতেও বিরোধী নেতা-কর্মীদের ধড়পাকড়ে যতটা ‘সক্রিয়’, ঠিক ততটাই ‘নিষ্ক্রিয়’ বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত শাসকদলের নেতা-কর্মীদের ধরতে। সে পুলিশকে চড় মারায় অভিযুক্ত সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়— কারওরই কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস দেখায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ।

অনুব্রত মণ্ডল মানে কেষ্টদার জামিনের দিনটা আমরা স্পষ্ট মনে আছে। নিঃশব্দে আদালতে এলেন। এজলাসে দাঁড়ালেন। বিনা বাধায় জামিন নিয়ে বেরিয়েও গেলেন। শাসকদলের অনুগামী অভিযুক্তের তো এমনটাই হওয়া উচিত। তিনি কী আর পাঁচ জনের মতো হেলাফেলার পাত্র! তাই পুলিশকে হুমকি দেওয়ার মামলায় পাঁচ মিনিটেই জামিন পেয়ে যান তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। বিরোধিতা তো দূর, দর্শকের ভূমিকায় থাকেন সরকারি আইনজীবী। কীই বা অপরাধ! ২০১৩-র পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বীরভূমের পাড়ুইয়ে কসবা গ্রামের সভায় পুলিশকে বোমা মারা ও নির্দল প্রার্থীদের (বিক্ষুব্ধ তৃণমূল) বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ‘পরামর্শ’ দেন অনুব্রত। তার পরে ওই অঞ্চলে একাধিক নির্দল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা হয়। নির্দল প্রার্থী হৃদয় ঘোষের বাবা সাগর ঘোষকে গুলি করে মারা হয়। অনুব্রত-সহ ৪১ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করেন নিহতের পুত্রবধূ শিবানী ঘোষ। এ আর এমন কী! এখন তো গোটা ঘোষ পরিবারটাই কেষ্টদার হাতের মুঠোয়।

এর পর আরও একটা পাঁচ মিনিটেই জামিনের নজির দেখেছি আমরা। অনুব্রত মণ্ডলের পর হাওড়ার ফুটবলার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। কী এমন অপরাধ করেছিলেন তিনি! এক ট্রাফিক পুলিশকে চড় মেরেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুব্রত মণ্ডলের মতো এক্ষেত্রেও সরকারি আইনজীবীরা জামিনের কোনো বিরোধিতা করেননি। লেকটাউনে প্রকাশ্য রাস্তায় গাড়ি ঘোরানো নিয়ে বিবাদে ট্রাফিক পুলিশকে চড় মেরেছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আমার তো মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলাটাই ছিল একটা বড় অপরাধ। শাসন করেছেন যাঁরা তারা একটু চড় মারতেও পারবেন না! সত্যি আজব আবদার!

গত ৭ আগস্ট সবং সজনীকান্ত কলেজ চত্বরে ছাত্র পরিষদ কর্মী কৃষ্ণপ্রসাদ জানা খুনের পরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তিনজন গ্রেপ্তারও হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মানে দিদি পুলিশকে বুঝিয়ে দেন যে ঘটনাটি সিপি-র নিজেদের গোলমাল তখনই একে একে গ্রেপ্তার করা হয় ঘটনার প্রধান অভিযোগকারী সিপি পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়-সহ ৪ জনকে। যে ২১ জনের নামে পুলিশ আদালতে চার্জশিট পেশ করে, তার মধ্যে ১৯ জনই সিপি সদস্য।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পুজো আসছে। মেতে উঠুন। সবার জন্য সমান আইন চাইলে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনাও করতে পারেন। তবে চুপিচুপি। দিদির কানে যেন না যায়।

— সুন্দর মৌলিক

হার্দিক প্যাটেলের আন্দোলন নিয়ে জাতীয় বিতর্ক হোক

তারক সাহা

যে কোনো দেশের আইন সমকালীন যুগের দাবিকে মেনে তৈরি হয়। এটাই সর্বকালীন দস্তুর। যেমনটা হয়েছিল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে। দেশের যখন সংবিধান রচনা হয়েছিল সেই সময়ে ওই রচয়িতাদের মধ্যে ড. আম্বেদকর ছিলেন অন্যতম। জাতপাতের বিচারে তাঁদের পরিবার ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর। বাল্যকালে তাঁর পরিবারকে অনেক সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। আর তারই পরিণামে আম্বেদকর দেশের নিম্নবর্গীয় মানুষদের উত্থানের জন্য সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসলে যুগের দাবি মেনে এই সংরক্ষণের আবশ্যকতা ছিল। অবশ্য সংবিধান প্রণেতারা এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করতে চাননি। তাঁদের ধারণা ছিল সংবিধানের বর্ণিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এক দশককাল বহাল থাকলে হয়ত সমাজের নিম্নবর্গীয়রা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসবে এবং অর্থনীতিতে এদের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হলো না। উলটে সংরক্ষণের নামে সাংবিধানিক এই বৈধতা উসকে দিল রাজনীতির লড়াইকে। জন্ম নিল উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি, মুলায়ম সিং-এর সমাজবাদী পার্টি, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল-সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোটছোট বহু দল। এমনিতেই আজকাল দেশের রাজনীতি বা তাদের নেতা-নেত্রীরা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নীতি বিসর্জন দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে জাত-পাতের লড়াইকে। এইসব নীতিভ্রষ্ট নেতৃত্ব নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এই সংরক্ষণের নীতির বিষময় পরিণাম দেশের অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত প্রসারিত।

কিন্তু ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনকে বলা যায় এক ব্যতিক্রমী নির্বাচন। কেননা জাত-পাত নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আপাতত ধরাশায়ী। রাষ্ট্রীয় স্তরে বিজেপি-র উত্থান একদা জাত-পাত রাজনীতির কারবারি, যারা এতদিন যুযুধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত থেকে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে, তারা আজ এক রঙ্গমঞ্চে সামিল। এই রঙ্গমঞ্চে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান মসিহা কংগ্রেসও সামিল বিহার বিধানসভা নির্বাচনে।

এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর অবতারণা কেবল এই সংরক্ষণের বিষময় পরিণামের কথা উল্লেখ করার জন্য। গত আগস্টের শেষে গুজরাটে যে হয়ে গেল এবং দাঙ্গায় বেমক্কা প্রাণ গেল ন'জন নিরপরাধ মানুষের, সেই দাঙ্গা কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, বরং বলা চলে আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোধা হলেন হার্দিক প্যাটেল। এমনিতেই গুজরাট সমৃদ্ধ রাজ্য। প্যাটেলরা রাজ্য অর্থনীতিতে এমন নয় যে তারা রাজ্যের অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া এক সম্প্রদায়। তবু কেন এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এমন রোষ? এর কারণ হলো 'যুগের দাবি'। 'যুগের দাবি' মেনে যেমন এদেশে চালু হয়েছিল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তেমনটা 'যুগের দাবি' মেনেই গুজরাট রাজ্যের মানুষ নেপথ্যে চায় এই ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা রদ হোক। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই আন্দোলন। এক অখ্যাত হার্দিক প্যাটেল রাতারাতি হিরো বনে গেলেন। সম্পন্ন রাজ্য হলেও এই জনরোষের পেছনে রয়েছে অর্থনীতি। এই দিকটা আমরা একটু ভেবে দেখি।

দুনিয়ার অন্য দেশের সঙ্গে ভারতেও চলেছে অর্থনীতির পালাবদল। পুরনো অর্থনীতির ধ্যানধারণা ঝেড়ে ফেলে বিশ্বের সকল দেশই ঝুঁকছে আর্থিক সংস্কারের দিকে। এই পরিবর্তনের যুগে সমস্যাও অনেক। ভারতের প্রধান অন্তরায় হলো জনসমস্যা ও তার বিন্যাস। পৃথিবীর বহু দেশে গড় বয়স বাড়লেও ভারতের গতি বিপরীতমুখী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষের বয়স ২৫ বছরের এবং ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। অনুমান আগামী আদম-শুমারির সময়ে জাতীয় গড় আয়ু দাঁড়াবে ২৯ বছরের নীচে। দেশের এই বিপুল যুব সম্প্রদায় আগামীদিনে করবে কী? আজও দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষিতে তেমন লাভ না থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতি সঙ্কটে। গ্রামের তরুণরা লাঙ্গল আর হাতে বলদ নিয়ে ক্ষেত-খামারে যেতে চাইছে না। শহর-নগরের ঝাঁ চকচকে জীবনের প্রতি প্রবল টান এদের নগরমুখী করে তুলছে।

গ্রামের কাঁচা মেঠো রাস্তা দিয়ে এরা হাঁটতে চাইছে না। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অংশীদারিত্ব ২০১৪ সালে কমতে কমতে এসেছে ১৪ শতাংশে যেখানে ১৯৯১ সালেও ছিল ৩২ শতাংশ। এর ফলে বাজারে জোগান কমছে পিঁয়াজ, আলুর মতো নিত্য ব্যবহার্য সবজির। লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়ছে, নাকাল হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

গুজরাটের প্যাটেল বা পরিদার গোষ্ঠী অতীতে ছিল জোতদার। এরা ছিল

ভূ-স্বামী। এককালে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এদের দাপট ছিল লক্ষণীয়। চাষবাসে সেরকম লাভ না থাকায় এদের পরিবারের যুবকরা চাকরি চাইছে। কিন্তু সেভাবে চাকরির সুযোগ কোথায়? ছিঁটেফোঁটা যেটুকু সরকারি স্তরে চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাতে রয়েছে সংরক্ষণের কাঁটা। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মাত্র একটি আসন রয়েছে সাধারণ শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য।

কেবল গুজরাটের প্যাটেল গোষ্ঠী নয়, উত্তরপ্রদেশের জাঠ, গুজ্জর গোষ্ঠীর মধ্যেও অসন্তোষের মেঘ জমেছে ঈশান কোণে। চাহিদা কমে যাওয়ায় পণ্য উৎপাদন কমছে। ফলে উৎপাদন শিল্পে উন্নয়নের হার কমছে। জাতীয় অর্থনীতিতে উন্নয়নের হার ৭ শতাংশ দেখানো হচ্ছে যদিও তা মূলত পরিষেবা শিল্পের উন্নয়ন কেন্দ্রিক।

সুতরাং দেশে যেটুকু কাজের সুযোগ হচ্ছে তা এই পরিষেবা কেন্দ্রিক (পর্যটন, স্বাস্থ্য, টেলি যোগাযোগ ইত্যাদি) এবং মেধাভিত্তিক (তথ্য প্রযুক্তি)। আর এইসব বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে পুরোপুরি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। শহর গ্রামের সম্পন্ন গরিব আপামর পরিবার ধার-কর্জ করেও তাদের ছেলে মেয়েদের বিপুল অর্থ ব্যয় করে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাচ্ছে। পরিকাঠামোর অভাবে অনেক যুবক-যুবতীই ঠিকমতো কর্মোপযোগী তৈরি হচ্ছে না। ফলে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকদের ১৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ স্নাতকদের মাত্র দশ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কর্মোপযোগী। এছাড়া শিল্পসমৃদ্ধ গুজরাটেও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে শ্রমনির্ভর শ্রমদিবস তৈরি হচ্ছে কম।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমনির্ভর বা হাতে-কলমে কাজ করা লোকের চাহিদা বাড়ছে, যাকে আমরা 'ব্লু-কালার জব' বলি। কিন্তু মুশকিল হলো এই ব্লু-কালার জবের জন্য যে দক্ষ কর্মী তৈরির প্রয়োজন তা নির্মাণে সংস্থাগুলির তীব্র অনীহা, কারণ এইসব সংস্থা দক্ষ কর্মী তৈরি করলেও পরবর্তীকালে বেশি অর্থের লোভে অন্য সংস্থায় যোগ দিচ্ছে।

কিন্তু বাস্তব হলো, কৃষিক্ষেত্র অলাভজনক, অর্থনীতির গতিমুখ ক্রমেই শিল্প ও পরিষেবা জুড়ে। ফলে চাকুরিপ্রবণ যুবকদের সামনে প্রবল চাপ। পুরনো ভারতের পুরনো মানসিকতার লোকজন তাদের পারিবারিক গৌরবের কথা স্মরণ করে নতুন প্রজন্মকে ছোট-খাটো কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। যে পরিবার আগে বিত্তবান ছিল, তাদের অস্মিতায় ধাক্কা খাচ্ছে। তাদের ছেলে আর যা-ই হোক শ্রমিক হবে না। সমাজ বা দেশের চালচিত্র উলটো দিকে বইছে। যে ছেলেটির কৃষিনির্ভর পরিবারে জন্ম সে কিন্তু ছ' মাসের কোনো আই টি আই ট্রেনিং নিয়ে ভবিষ্যতে এক অচেনা শহরে গিয়ে দক্ষ শ্রমিক হয়ে দাঁড়াবে তা অনেকক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। গুজরাট শিল্পসমৃদ্ধ হলেও স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের সেখানে চাকরি খুব একটা হচ্ছে না। যেমন নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকরা আসছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড থেকে। আবার জাহাজ নির্মাণের মতো ভারীশিল্পে শ্রমিক আসছে তামিলনাড়ু, কেরল থেকে। সুতরাং এর ফলে তৈরি হচ্ছে অসন্তোষ। এই অসন্তোষ তৈরি করছে হার্দিক প্যাটেলের মতো মানুষরা। এরা বিভিন্ন শিল্পে নিজেদের সেভাবে তৈরি করতে না পেরে সরকারি 'হোয়াইট কালার' চাকরির দিকে ঝুঁকছে। সেখানেও তারা ধাক্কা খেয়ে সংরক্ষণের দেওয়ালেও আবার ধাক্কা খাচ্ছে। সুতরাং এই ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরি করেছে দাবানল।

কাজেই সরকারি নীতি নির্ধারকদের ভাবতে হবে এই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যদি সংরক্ষণ চায়, তবে দেখা যাবে সংরক্ষণের কোনো অর্থই নেই। তাই 'যুগের দাবি' হলো সংরক্ষণ যদি করতেই হয় তবে তা হোক আর্থিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে। এতে গুজরাটের ডাংসের মতো প্রত্যন্ত গিরি-কন্দরবাসী তরুণ-তরুণীরা সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে আবার মুম্বই, দিল্লীর মতো মহানগরের আর্থিক পিছিয়ে পড়া মুসলমান, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান প্রভৃতি জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ উপকৃত হবে। চটজলদি এই সমস্যার সমাধান হবে না বটে, কিন্তু এ নিয়ে জাতীয় বিতর্ক তৈরি করা যায়। এর ফলে খতম হবে জাত-পাত নিয়ে রাজনীতি। গুজরাটে সংরক্ষণ নিয়ে স্তূপীকৃত বারুদে আগুন লাগলে, তা অন্যরাজ্যেও ছড়িয়ে যাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব সরকারের। ■

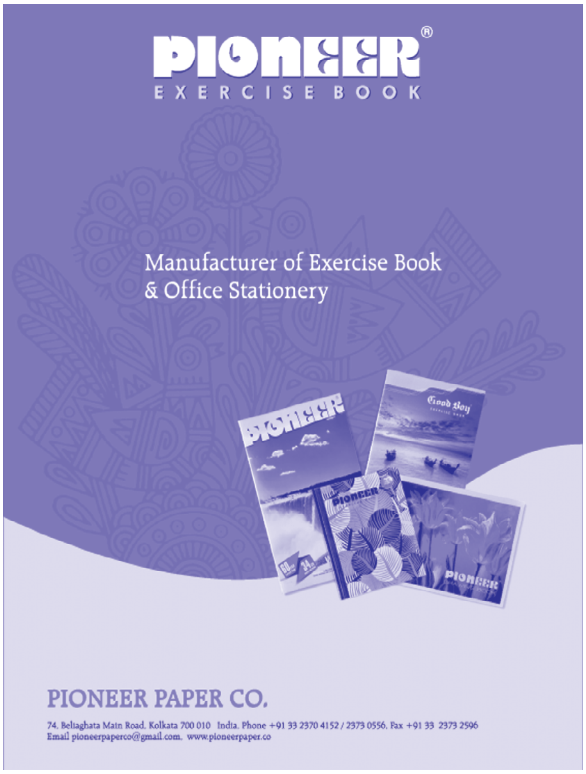

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণেই সামাজিক অবক্ষয়

অম্লানকুসুম ঘোষ

মানব শরীর যেমন রক্ত-মাংস- অস্থি-মজ্জা ও দেহের নানা অভ্যন্তরীণ যন্ত্র নিয়ে গঠিত হলেও আত্মা বা প্রাণ ছাড়া সেই শরীর কোনো প্রকার জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে না। সেরকম একটি জাতি আইন, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা দিকে উন্নতি লাভ করে নিজের রাষ্ট্রীয় জীবনের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ সমাজের বিকাশ এবং বৃদ্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্র মৃতবৎ পড়ে থেকে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের শোভাবর্ধন করে থাকে। এর উদাহরণ আমরা দেখেছি ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতির চরমতম শিখরে আরোহণ করেও সামাজিক সুস্থিতির অভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অবশেষে শান্তির খোঁজে তারা আশ্রয় চাইছে ভারতেরই সামাজিক পরিকাঠামোর কাছে।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের দেশে শাসনব্যবস্থার বিকাশের বহু পূর্ব থেকে সামাজিক বিকাশের সূচনা হয়েছে। ফলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের মতো সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়নি কখনোই। রাষ্ট্রীয় বিকাশের অভাবে রাষ্ট্রীয় উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বহুবার, সঠিক রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাবে রাষ্ট্র বিপন্নও হয়েছে বারবার। কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক শক্তির বলে সেইসব বিপর্যয়ের দিনেও জাতি ধ্বংসের পথে না গিয়ে বরং উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত করেছে নিজেকে এবং সেই সামাজিক শক্তির বলেই রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়কেও রোধ করেছে। ফলে ইতিহাসে দেখা গেছে যে বলদর্পী মধ্যপ্রাচ্য, উন্নত সৈন্যশক্তির বলে বলীয়ান পাশ্চাত্য সকলেই নতি স্বীকার করেছে ভারতীয় সমাজ শক্তির কাছে। রূপকথার রাক্ষসের প্রাণ ভোমরার মতো ভারতের প্রাণশক্তি যেন নিহিত ছিল ভারতের নিষ্কলুষ সদজাগ্রত সমাজব্যবস্থার মধ্যে।

কিন্তু হাওয়া যেন আজ উলটো দিকে বইছে। সামাজিক মূল্যবোধহীন পাশ্চাত্য যখন ভারতীয় সমাজের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী তখন বহু পুরাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা আজ চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন। তাইতো যে সমাজব্যবস্থা একদা দেশব্যাপী এক শান্তির তপোবন সৃষ্টি করেছিল, 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ'-এর এক স্বর্গে পরিণত করেছিল ভারতবর্ষকে। সেই সমাজব্যবস্থা আজ বিপর্যয়ের মুখোমুখি। তাইতো আজ খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় নেতিবাচক খবরের ছড়াছড়ি। পিতা বা মাতার দ্বারা পুত্র অথবা কন্যা হত্যা, সন্তানের দ্বারা মাতাপিতার হত্যা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা এসব ঘটনা তাই আজ আর জনজীবনে আলোড়ন ফেলে না, সাধারণ লোকের কাছে এগুলি আজ স্বাভাবিক ব্যাপার দিনগত পাপক্ষয়ের অন্তর্গত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঘটনাগুলি ঘটে সম্পত্তির লোভে, কখনো বা মত্ত অবস্থায়। আশঙ্কার কারণ হলো— এই সামাজিক অভিশাপ সমাজের কোনো এক বিশেষ বলয়ে আবদ্ধ নেই। ধনী থেকে নির্ধন, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত সমাজের সকল অংশই আজ এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। তাইতো সংবাদপত্রের প্রথম পাতা আলো করে থাকা মা কর্তৃক সন্তান হত্যার (অর্বুদের মাপযোগ্য সম্পত্তির লোভে) খবরের পাশাপাশিই আমরা ভেতরের পাতায় ছোট খবরে দেখি সন্তান কর্তৃক মাকে হত্যার ঘটনা (সামান্য এক বিঘে জমির জন্য)। অশিক্ষিত পরিবারে পিতা-মাতা-সন্তানের পারস্পরিক বিরোধের পাশাপাশিই আমরা দেখি উচ্চশিক্ষিত আইপিএস আধিকারিকের দ্বারা আদালতে হলফনামা দিয়ে নিজের মাকে ভিখারিণী পরিচয় দেওয়ার খবর (পৈতৃক সম্পত্তির নিঃস্বপত্র অধিকার লাভের আশায়)। পরিসংখ্যান এবং তার দ্বারা করা বিশ্লেষণ এসব ক্ষেত্রে অচল। কারণ মানুষের মনোজগতের চিন্তার প্রতিফলন সবসময় কার্যে পরিণত হয় না। কিন্তু সমাজের মধ্যে বড় প্রভাব রেখে যায়। সেই সব কর্মে পরিণত না হওয়া চিন্তা পরিসংখ্যানে আসে না। তাই শুষ্ক পরিসংখ্যান নয়, বরং দুষ্কর্মে পরিণত হওয়া হিমশৈলের চূড়াতুল্য ঘটনাগুলিকে হিমশৈলের বাকি অংশের ন্যায় গরিষ্ঠ অংশ কীভাবে নিচ্ছে তার দ্বারা বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। এই সময়ের সাক্ষ্য কিন্তু বড় করুণ। আপামর জনসাধারণ এই ঘটনাগুলিকে নিন্দার চোখে দেখে না, বরং কাজটির পরিকল্পনা, নৈখুঁত্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকে অর্থাৎ কাজটি ঠিক হলো কিনা তার বদলে কাজটি ঠিক ভাবে করা হলো কিনা তাই হয়ে ওঠে বিবেচ্য। ন্যায়পরায়ণতার বদলে অন্যায় সাধনের দক্ষতাই যেন সেখানে মূল মাপকাঠি। হাহাকারময় এই সময়ে এই সমাজে দাঁড়িয়ে মনে হয় এ বড় সুখের সময় নয়, এ বড় শান্তির সময় নয়। মনে পড়ে যায় ম্যাকবেথের সেই সময়ের কথা। নিদ্রামগ্ন রাজাকে হত্যা করার পর ম্যাকবেথ-এর সেই আত্মগ্লানিময় হাহাকারের কথা--- "ম্যাকবেথ, তুমি নিদ্রাকে হত্যা করেছ, তুমি আর কোনোদিন শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারবে না।" আমাদের বর্তমান অভিশপ্ত সময়ে এই

অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পদার্পণরত সমাজে অবস্থান করে আমাদেরও তাই মনে হয় আমরা যেন শান্তির সুখের সমস্ত সম্ভাবনাকে সহস্তে নির্মূল করেছি।

কিন্তু এরকম হলো কেন? বিশ্বসংসারের নিয়ম মেনে সমাজব্যবস্থাতেও কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কাজেই এই অবক্ষয়েরও কিছু কারণ আছে তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ব্যাধির মূল নিহিত রয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মধ্যে। উন্নত বিজ্ঞান, নিখুঁত রাষ্ট্রপরিচালনা জ্ঞান ও বিশ্লেষণী শিক্ষাব্যবস্থার অধিকারী পাশ্চাত্যের মুখোমুখি যখন হয়েছিল বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মদাত্রী দেশ ভারতবর্ষ, তখন নিয়তির এক অদ্ভুত পরিহাসে সে ছিল হৃতসর্বস্ব (৮০০ বছরের মুসলমান শাসন ও শোষণের ফলে)। সেই যুগসন্ধিক্ষণে তাই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল একথা ভেবে যে এই নবাগত সভ্যতাকে সে কীভাবে স্বাগত জানাবে— গ্রহণের দ্বারা, না বর্জনের দ্বারা। তারা প্রতিক্রিয়াও তাই হয়েছিল নানাবিধ। কেউ কেউ গ্রহণ করেছিলেন নির্বিচারে, কেউ কেউ বর্জন করেছিলেন নির্বিচারে। শেষে অনেক বর্ষব্যাপী সাগর মন্থনের পরে দেশবাসী পাশ্চাত্যের বহিরাবরণরূপী প্রথা, আচার এবং ঘুণধরা সমাজব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিল। এবং নিজের অন্তর্জগতের শক্তির উৎসগুলিকে বর্জন করেছিল। অর্থাৎ অমৃতের পরিবর্তে গরলকেই গ্রহণ করেছিল করপুটাঞ্জলিতে। সেই গরলেই প্রভাবে আজ আমাদের সমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অথচ পাশ্চাত্যের অনুসারী বৌদ্ধিক উন্নতি যার দরকার ছিল তা রয়ে গেছে সুদূরপরাহত। তার ফলে পাশ্চাত্যানুসারী বাহ্যিক ভোগবিলাস, ব্যয়বহুল আচার অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রার নানা মাপকাঠিতে আবদ্ধ হয়ে দেশবাসীর চাহিদা বেড়েছে কিন্তু পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি করায়ত্ত না হওয়ায় জোগানের একটা ভারসাম্যের অভাব দেখা যাচ্ছে। ভোগ্যবস্তুর প্রতি বর্ধিত এই আকাঙ্ক্ষাকে উপার্জনক্ষমতা দিয়ে পূরণ করতে না পেরে অসৎ পথ অবলম্বন করছে। যারা করতে পারছে না তারাও মনে ভাবছে ‘এরকম করতে পারলে বেশ হোত।’ বাড়তি আকাঙ্ক্ষার পূরণ করতে গিয়ে চিরন্তন সম্পর্কগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ভাবছে। সামাজিক অবক্ষয়ের শুরু এখান থেকেই।

তাই আজ সময় এসেছে পরিবর্তনের। নির্বিচার অনুকরণের বদলে বিচারনির্ভর আত্মীকরণের। যার বলে আমরা পাশ্চাত্যের গ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহকে নিজেদের প্রয়োজনমতো করব গ্রহণ আর তাদের বর্জনীয় বিষয়সমূহকে বর্জন করতে পারব নিজেদেরই বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী। ফলস্বরূপ উন্নত উৎপাদনশক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশবাসী পারবে নিজের উৎপাদন অর্থাৎ উপার্জন অর্থাৎ জোগান বাড়াতে।

অপরদিকে বাহ্যিক ভোগব্যবস্থার প্রাচীন ভারতীয় ব্যবস্থায় আস্থাশীল হয়ে নিজের চাহিদাকে পারবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। ফলে চাহিদার পূরণের জন্য অসৎ পথের দ্বারস্থ হতে হবে না কাউকেই। একমাত্র তাহলেই বর্তমানের ক্লেদ-পঙ্কিল সামাজিক ব্যাধিসমূহকে সমূলে নির্মূল করে মূল্যবোধের ভারতীয় পুনঃপ্রবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। আর যদি এ পথ দেশবাসী না নেয়, উন্নতির সহজ পথের বদলে পতনের মায়াময় ধ্বংসের পথকেই গ্রহণ করে? তাহলে দীর্ঘদিনের এই ছায়াপ্রাদানকারী গোটা বিশ্বের পথপ্রদর্শনকারী ভারতীয় সমাজরূপী মহীরুহের শেষের সেদিন বড় ভয়ঙ্কর হবে।

‘ কিরূপ নারীচরিত্রকে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করব? নারী কি শক্তিশালিনী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না, সঙ্কটকালে অবিচলিতা হবেন? তাহলে চিতোরের পদ্মিনী, চাঁদবিবি, ঝাঁসির রাণী কি নেই? নারী কি সাধিকা, কবি এবং দিব্যানুভূতিসম্পন্না হবেন? তাহলে আমাদের মীরাবাঈ আছেন। নারীকে কি আমরা মহিমময়ী, শাসনকুশলা সম্রাজ্ঞীরূপে দেখতে চাই? তাহলে রাণী ভবানী, অহল্যাবাঈ এবং মৈমনসিংহের জাহ্নবী দেবীর মতো নারী আর কোথায়? আছেন?’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

নাগরিক নিঃস্পৃহতাই সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ

কে. এন. মণ্ডল

গণতন্ত্রের সাফল্য তার প্রয়োগে। আর প্রয়োগের অর্থ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবরকম স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি ও দলতন্ত্রের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য অতন্দ্র প্রহরা। এই কথাগুলো যত সহজে উচ্চারিত হলো— তা বাস্তবায়িত করা ততোধিক কঠিন। কারণ যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতারোহণ করেন, খুব শীঘ্র তারাই গণতান্ত্রিক রীতি-নিয়মকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলিকে কব্জায় এনে দলীয় বহুরূপী গ্রুপ তৈরি করেন। নিজেদের কীর্তন-ভজনের জন্য এবং সবরকম চক্ষু লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে বিরুদ্ধ মতকে পদানত করেন যাতে ভিন্নমত প্রশ্রয় না পায়। অথচ গঠনমূলক বিরুদ্ধ-মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে জাগ্রত বিরোধী পক্ষই গণতন্ত্রের ভিত্তি। আর গণতান্ত্রিক এই অধিকারই গণতন্ত্রকে একটি চলমান বহুত্ববাদী প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে। এ বিষয়ে ভল্টেয়ারের (Francosismarie Arouet) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'I don't agree with what you say but I must fight for your right of saying so.' অর্থাৎ 'আপনি যা বলছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই, তবে আপনার একথা বলার অধিকারের জন্য আমি অবশ্যই লড়ব'। সত্যি কথা বলতে কী, এই মনোভাবকেই বলে সঠিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুশীলন। এর পাশাপাশি আমাদের বিধানসভাগুলি এবং সংসদের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে আপনি দেখবেন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা গণতন্ত্রের যোগ্য কিনা?

প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকদের থেকে শুরু করে বর্তমানের রাজনৈতিক দার্শনিকরা অনেকেই একমত যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট তার সফল প্রয়োগে, আর তা নিশ্চিত করতে পারে সজাগ, সচেতন এবং আত্মমর্যাদাশীল নাগরিকেরা যাঁরা ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। কী ধরনের শাসক মানুষ পাবে, আর তাঁরা নির্বাচক মণ্ডলীর চাহিদার প্রতি কতটা সংবেদনশীল থাকবে তা নির্ভর করছে নির্বাচক মণ্ডলীর যোগ্যতার নিরিখে। তাই ফ্রান্সের রাজনৈতিক দার্শনিক জোসেফ মেসট্রারের শতাব্দী পুরনো মন্তব্য— 'A nation gets a Govt. which they deserve অর্থাৎ একটি দেশ সে ধরনের সরকারই পাবে যার যোগ্য তারা'— আজও প্রাসঙ্গিক। একথা মূল্য দিয়ে ভারতীয়রা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করছে।

নাগরিকদের গয়ংগচ্ছ ভাব বা নিঃস্পৃহতাই দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক এবং প্রশাসককে সুযোগ করে দিচ্ছে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হতে এবং প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার সাহস যোগাচ্ছে। ফলে অভিমান করে অনেক বিদ্বজ্জন ও বিশিষ্টরা আজ রাজনীতি থেকে দূরে থাকছেন। তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত হচ্ছেন সুশাসন থেকে। আবার কেউ কেউ সরব প্রতিবাদীদের দলে, রাজনীতির লোক দেখলে গোসা করেন— নিজেদের গুটিয়ে নেন এবং নিরাপদ দূরত্ব রেখে খাঁটিত্ব বজায় রাখেন। তাতে আশকারা পায় দুর্বৃত্তরা। প্রকৃত গণতন্ত্রীরা মানবতা, আইনের শাসন, সভ্য সমাজের আচরণ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হবেন, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের রাজনৈতিক রঙ না দেখে। এ ব্যাপারে কোনো বাছ-বিচার নিশ্চিতভাবে ধর্ষকের, উদ্ধতের, স্বৈরাচারীর হাত শক্ত করবে। আর সমাজের এই নেতিবাচক মনোভাব থেকেই শুরু হয় অবক্ষয়ের জয়যাত্রা। একবার এই জয়যাত্রা শুরু হলে সমাজের মূল্যবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য— সকল ক্ষেত্রেই নৈরাজ্য দেখা দেবে, গভীর তমশায় নিক্ষিপ্ত হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

> 'অপরিচ্ছন্ন এই অজুহাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে অবজ্ঞা ভরে অবহেলা করলে, সর্বাধিক যে মূল্য দিতে হয় সেটা হলো নিকৃষ্টতর মানুষ কর্তৃক শাসিত হওয়া'।

সম্প্রতি বালি পৌরসভায় (বর্তমানে হাওড়ার সঙ্গে বিলুপ্ত) একজন সাব-অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ঘুষের টাকার অঙ্ক প্রায় ২২ কোটি টাকা। সে খবর সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কোনো এক সময় এক কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুখরামের বাড়ি থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এই খবরই ছিল অবিশ্বাস্য, আর আজ এক খুদে ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে ২২ কোটি টাকা উদ্ধার! বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলাম একি অবিশ্বাস্য সামাজিক ও প্রশাসনিক অবক্ষয়! রাজনীতি এবং প্রশাসনে কি কোনোরকম ওয়াচ ডগ-এর ব্যবস্থা নেই? সর্বত্র কি এই জিনিসই লুকিয়ে আছে, আর তা উদ্ধার করতে আর একজন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জন্ম নিতে হবে?

দুর্নীতি আজ প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর একাজ রাজনীতিক প্রশাসনিক মেলবন্ধন ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। তাহলে দুর্নীতি দমন শাখায়ই কি দুর্নীতির চাষ হচ্ছে? আমার এক বন্ধু ছোট একটি ওষুধের দোকান চালিয়ে তার পরিশ্রম ও সততার বলে

সামাজিক অবক্ষয় : বিশিষ্ট কয়েকজনের দৃষ্টিতে

ভারতীয় সমাজজীবনে সামাজিক অবক্ষয় আগেও ছিল। কিন্তু প্রচারের আলোয় সেই চিত্রকে উঠে আসতে দেখা যায়নি। আজকের দিনে খারাপ কাজ যা ঘটছে তা প্রকটভাবে পরিবেশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগে পর্যন্ত সেই সমস্ত চিত্র এমনভাবে উঠে আসেনি। সমাজে অনেক ভাল কাজ চলছে, যেগুলি সর্বস্তরে প্রশংসিতও হচ্ছে। কিন্তু প্রচারমাধ্যমের আলোয় তা সেভাবে আসছে না। অবক্ষয় আগেও ছিল এখনও আছে। তবে আগে সেইগুলি প্রচারের আলোয় আনা হোত না। বর্তমানে তা হচ্ছে। সদর্থক কাজগুলি প্রচারমাধ্যমে উঠে আসার প্রয়োজন।

প্রচারমাধ্যমে বেশি পরিমাণে ভালো কাজের উদাহরণ সকলের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সমাজের অবক্ষয়ও তুলে ধরুক, কিন্তু দু'টির মধ্যে ব্যালান্স করে তা করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন। আলো এলে অন্ধকার আপনা আপনি দূর হবে।" সুতরাং সমাজের ভালো কাজ মানুষের সামনে বেশি পরিমাণে উঠে আসলে সমাজের অবক্ষয় কমে আসবে। মানুষের মধ্যে উন্নত চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। ফলে কমে আসবে সমাজের অবক্ষয়।

—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ,
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকানন্দের
পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে অবহেলা করছি, নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতার অপব্যবহার করছি। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সমাজে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি। সীমাহীন চাহিদা যেনতেন প্রকারণে পূরণ করতে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা ভুলে যাচ্ছি। 'আমিত্ব' বেড়ে যাচ্ছে যা ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী। সেই কারণেই আগে যে ধরনের অপরাধ প্রবণতা পাশ্চাত্যে দেখা যেত, তা এখন ভারতবর্ষে বেশি দেখা যাচ্ছে। সামাজিক বাঁধনটাও নেই। বাবা-মায়েরাও এখন বিভিন্ন কারণে ছেলেমেয়েদের সঠিক দিশা দেখাতে পারছেন না, চারিত্রিক গঠন তৈরি করতে পারছেন না। সমাজে প্রতিবেশীরাও পাশের বাড়ির লোকজনের সম্পর্কে সচেতন নয়। 'পাড়া কালচার' উঠে গিয়ে 'ফ্ল্যাট কালচার'-এর বৃদ্ধি আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা আরোও বাড়াচ্ছে।

ভারতীয় আদর্শ, পরম্পরা, ঐতিহ্য আমাদের অনুসরণ করা উচিত। পাশ্চাত্যের ভালো গুণগুলি যেমন নিয়মানুবর্তিতা, কর্মসংস্কৃতি অনুসরণ না করে পাশ্চাত্যের অবাঞ্ছিত দিকগুলো আমরা গ্রহণ করছি। বাড়ির শিশুটিকে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে পরিণত করার জন্য মায়েদের বিশেষভাবে সচেতন হওয়া আবশ্যিক। প্রযুক্তি ও আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধনেই আদর্শ সমাজ গড়া সম্ভব।

—নীলাঞ্জনা রায়, সম্পাদিকা, সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ

ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তিনি বারুইপুর প্রফেশন ট্যাক্স অফিসে দু'দিন ঘুরেও ট্যাক্স জমা করতে পারেননি। দোকান বন্ধ রাখায় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে তৃতীয় দিনে ৫০০ টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ট্যাক্স জমা করেন। নিয়মিত ট্যাক্স জমা করায় যেখানে তার পুরস্কৃত হওয়ার কথা— সেখানে তাঁকে উৎকোচ দিতে হচ্ছে ট্যাক্সের টাকা জমা করতে। এটা একটা উদাহরণ মাত্র। অধিকাংশ সরকারি অফিসে সাধারণ মানুষের এটাই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। বালি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আজ যে কথাই বলুন, এত বড় দুর্নীতির কোনো আচ পাননি একথা বিশ্বাস করলে ধরে নিতে হবে তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ। সর্বত্র এই প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতি-পরায়ণতা NREGS-সহ বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা। আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বল্গাহীন দুর্নীতির উৎস— Power corrupts, absolute power corrupts absolutely, একমাত্র সচেতন, দুর্বার জনমতই পারে উদ্ধত, দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসকের রাশ টানতে।

সুতরাং, প্রত্যেক নাগরিক যদি তাঁদের

সামাজিক অবক্ষয় : বিশিষ্ট কয়েকজনের দৃষ্টিতে

পারিবারিক ঘটনা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা সবার সামনে এনে সমাজের বিশ্রী দিককে তুলে ধরার দরকার নেই। এরকম ঘটনা যে কোনো পরিবারে ঘটতেই পারে। সেটাতে বাড়াবাড়ি করার কী আছে? এতে ছোট ছেলেমেয়েদের উপরে প্রভাব পড়ে। এগুলো নিয়ে আলোচনা আমরা করবো না। আমরা যারা সমাজের মধ্যে একটু শিক্ষিত, তাদের এটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো ঠিক হবে না। খবর হয়েছে— শেষ হয়ে গেছে। বাড়াবাড়ি করার দরকার ছিল না।

শিনা হত্যার মতো ঘটনা সমাজের বুকে ঘটে এবং আগেও ঘটেছে। তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। মেয়েদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ন্যায় অন্যায় বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। সিনেমা, সিরিয়ালের জাঁকজমক দেখে মনেই হয় না গরিব আছে আমাদের দেশে। আগেকার দিনে বিধবা হলে যে অত্যাচার করা হোত, বেনারস পাঠানো হোত, আমাদের সমাজের কুসংস্কার, কুপ্রথা, অশিক্ষা এবং একদা মেয়েদের উপর পুরুষদের যে কর্তৃত্ব ছিল, এগুলো তো এখন নেই। তবুও এগুলো দেখানো হয় কেন? টাকাপয়সার প্রতি লোভ, অসীম চাহিদা এই ঘটনাগুলি ঘটার পিছনে এক অন্যতম কারণ। এই ধরনের সিরিয়াল বন্ধ হওয়া উচিত। একটা সুন্দর পারিবারিক ছবি দেখানো যায় নাকি? ছোটোবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে হবে। খেলতে খেলতে রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে জানাতে হবে যাতে খেলাচ্ছলেই ছোটো থেকে ভালো মন্দ নির্বাচন করতে শেখে। বর্তমানে কোনটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি, কোনটা নয়, বড়দের শ্রদ্ধা করা এসব শেখানো। বর্তমানের কর্মব্যস্ত বাবা-মায়েরা সন্তানের সঙ্গে সারাদিন না থাকার অভাবটা মেটানোর জন্য সন্তান যা চায়, তাই-ই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়। এটা ঠিক নয়।

—শ্রীমতী মহুয়া ধর, পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহিকা, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

সমস্ত সমাজটাকে বর্তমানে রাজনৈতিক নেতারা পরিচালনা করছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমস্ত কাজ তাঁরা করছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর তাঁদের এই কাজের জন্য সমাজের কাছে এক বার্তা পৌঁছেছে, যা কখনই আশাপ্রদ নয়। সমাজের মূল্যবোধ হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটি অন্যতম কারণ।

একটা সমাজ তখনই বেঁচে থাকে যখন সামাজিক মূল্যবোধ শেখানো হয়। আগে এই মূল্যবোধ শেখানো হতো। কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। পুনরায় তা চালু করা উচিত। কারণ মূল্যবোধ ঠিক না হলে মনুষত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব।

মা মেয়েকে খুন করছে, ব্যাঙ্ক অফিসার নৃশংস খুন করছে— এগুলি সমাজের অবক্ষয়। আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয় তার মাধ্যমে মানুষের মনে এক প্রভাব পড়ে। এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও মানুষ এই সমস্ত কাজ করে বসে। আসলে বিনোদন জগৎ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বিস্তর তফাত। তা সত্ত্বেও যদি এই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয় তাহলে রোজকার জীবনে তার প্রভাব পড়ে। এইগুলি সমাজকে রীতিমতো কলুষিত করছে।

এসমস্ত রোধ করতে গেলে সরকার থেকে আইন করা উচিত। কারণ সমাজে যাঁরা কাজ করছেন তাদের যাতে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আর রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে সুস্থ সমাজ গড়া, এবং অবক্ষয় দূর করা সম্ভব।

—অজয় নন্দী, অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট

সামাজিক দায় এবং রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে পারেন তাদের কৃত কর্মের জন্য, তাহলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমস্ত দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি Dr. K.R. Narayanan -কে দার্শনিক প্লেটোর উদ্ধৃতি দিয়ে আক্ষেপ করতে হোত না এই বলে (ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক আয়োজিত দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনে ১৯৮০ সালে এক আলোচনা সভায়), 'অপরিচ্ছন্ন এই অজুহাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টিকে অবজ্ঞা ভরে অবহেলা করলে, সর্বাধিক যে মূল্য দিতে হয় সেটা হলো নিকৃষ্টতর মানুষ কর্তৃক শাসিত হওয়া'।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসর প্রাপ্ত আধিকারিক)

চিঠিপত্র

ভিক্ষাবৃত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম

খবরে প্রকাশ, ভিক্ষাবৃত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে। আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার রিপোর্টে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্দশার এই করুণচিত্র ফুটে উঠেছে।

সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, সারাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৬৯টি পরিবারের আয়ের উৎস হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮১৮টি পরিবার (প্রায় দু' লক্ষ)। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভিক্ষুক রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ভাবা যায়? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরা একদা বলত এদেশকে—Land of beggers. অর্থাৎ ভিখারির দেশ। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও কোনো সরকার ইংরেজদের করা সেই অপমানজনক উক্তিকে ভুল প্রমাণ করতে পারেনি। ভাবতে অবাক লাগে, ভারত একাধারে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ, আবার অন্যদিকে ভারতের একশ্রেণীর মানুষ ভিক্ষাকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছে— কেউ কেউ না খেতে পেয়েও মরছে!

২০১১ সালের জুন মাসের পর সারাদেশের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। একথার অর্থ, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরই পশ্চিমবঙ্গে চালানো হয়েছিল এই সমীক্ষা। অর্থাৎ, তৃণমূল রাজত্বের বিগত চার বছরে এ রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির যে কোনো উন্নতিই হয়নি তা সমীক্ষার রিপোর্টেই স্পষ্ট। আর হবে নাইবা কেন? এই রাজত্বে না হয়েছে উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপিত, না হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ফলে এরাজ্যে হু হু করে বাড়ছে অভাব, বেকারত্ব তথা আর্থিক অবনতি। স্বভাবতই এক শ্রেণীর মানুষ কাজ না পেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির স্বার্থে ভিক্ষাবৃত্তিকেই নিয়েছে বেছে।

তবে একথাও ঠিক, রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের এহেন আর্থিক দুরবস্থার দায় পূর্ববর্তী বাম সরকার এড়াতে পারে না। কারণ তারা ৩৪ বছর এরাজ্যে রাজত্ব করেছে। এই দীর্ঘকালের বাম রাজত্বেও রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি যে হয়নি সে কথাও রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। আসলে তথাকথিত গরিবের বন্ধু বামপন্থী সরকার মুখে গরিব দরদির মুখোশ পরে গরিবদের শোষণ ও শাসন করেছে---তাদের ঠকিয়েছে। ফলত এ রাজ্যে ধনী হয়েছে আরও ধনী এবং গরিব হয়েছে আরও গরিব। ধনী ও গরিবের সেই ফারাকটা তখন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার একটা প্রভাব বর্তমান রাজত্বের গরিবদের উপরেও এসে পড়েছে। আর এই সরকারও সেই গরিবদের উন্নতি ঘটাতে পারেনি। উল্টে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও ঘটেছে অবনতি— যার পরিণতিতে ভিক্ষাবৃত্তির এই আধিক্য। সারাদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি

সম্প্রতি ধর্মভিত্তিক জনগণনার সমীক্ষায় দেশে মুসলমান সম্প্রদায় বৃদ্ধির হার সর্বাধিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশ যে ২০০১ থেকে ২০১০ এই দশ বছরে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ধর্মের জনসংখ্যা হ্রাস পেলেও ব্যতিক্রম একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে মুসলমানের বৃদ্ধির হার ২৪.৬ শতাংশ। আবার ১৯৯১-২০০১ সালে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ২০.৩ শতাংশ সেখানে মুসলমানের বৃদ্ধির হার হলো ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ সেই সময় মুসলমান বৃদ্ধির হার হিন্দুর তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ বেশি ছিল। তাই এই বৃদ্ধির হার ক্রমশই যে বাড়তে থাকবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা দেশের জাতীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অশনি সংকেতের বার্তা বহন করে। তবে আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু রাজনৈতিক নেতার পরোক্ষ মদতেই এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে দেশ। বস্তুত সংবিধান রচনার সময়েই সংখ্যালঘু শ্রেণীকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দ্বারা, ধর্মনিরপেক্ষভাবে, সুনিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ ছিল। কিন্তু সংবিধান প্রণেতারা সেপথে যাননি। বিশ শতকে তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লি বলেছিলেন rally the minorities। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংযুক্ত করো। তখন থেকেই সংবিধানে সংখ্যালঘুরা স্থান করে নেয় এবং বুঝে যায় যে তারা স্বতন্ত্র, পৃথক ও দেশের মূলস্রোতের বাইরে। এছাড়াও ১৯৫৫-৫৬ সালে উত্তরাধিকার, সম্পত্তি বণ্টন, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে যে আইন করা হয় তাতে বেশিরভাগ নাগরিককে এক্তিয়ারভুক্ত করা হলেও মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এদেশের আইন প্রণেতারাও পরোক্ষে মদত দিয়ে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। আর তথাকথিত কিছু সেকুলার রাজনৈতিক নেতানেত্রীর মুসলমান তোষণের ফলে এখন পরোক্ষ পরিকল্পিত ভাবে দেশে মুসলমান বৃদ্ধির হার ক্রমশই বাড়তে থাকছে। মুসলমান সংরক্ষণ, মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি, ইফতার পার্টির রমরমার নেপথ্যে যেন কিছু রাজনৈতিক নেতানেত্রীর মুসলমান তোষণে অশুভ প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু এই অশুভ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্যায় সুবিধা দিয়ে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের ফলে আবার দেখা দিতে পারে সামাজিক দেশ বিভাজনের বিভীষিকা।

কিন্তু এই তোষণনীতি ও মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশ আগামীদিনে আবার বিভাজনের পথে এগিয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আর এভাবে চলতে থাকলে এদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তাই সমগ্র জাতির মানুষের পরিচয় যদি হয় ভারতীয়

তবে স্বাভাবিকভাবেই দেশের সমস্ত মানুষের জন্য একই অনটন ও আর্থসামাজিক নীতি চালু থাকা উচিত। আর প্রয়োজন সংগঠিত ভারতীয় চেতনা, সেখানে সমবেত হতে হবে সমগ্র হিন্দু সমাজ ও প্রগতিশীল অহিন্দু সমাজকেও। তবেই সামাজিক বিভাজনের অশুভ প্রচেষ্টা স্তব্ধ হতে পারে।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

নীল দর্পণ-এর ইংরাজি অনুবাদ

স্বস্তিকায় ৩ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায় রূপশ্রী দত্ত-র লেখা একটি উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন। লেখিকা প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিষয়ে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকখানির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন জেমস্ লঙ। এ তথ্য সঠিক নয়।

দীনবন্ধু মিত্র বাংলায় নাটকখানি লিখে পূর্ববঙ্গ থেকে নৌকাযোগে কলকাতায় এসেছিলেন কাউকে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য। শ্রীমিত্র ডাকবিভাগের করনিক ছিলেন। ইংরেজ বিরোধী নাটক, তাই কেউ সাহস পাননি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে। অবশেষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৬ বোতল মদের বিনিময় ইংরেজিতে লিখে দিতে রাজি হয়েছিলেন। এক রাত্রিতেই নাটকখানি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

জেমস্ লঙ্ সাহেব ইংরেজিতে অনুবাদ করেননি। তিনি লঙ্ পাদ্রী নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। লঙ্ পাদ্রী প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে নিজের নামে প্রকাশ করার কারণে ইংরেজের রোষানলে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। বিচারে তাঁকে বিচারক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। সেই অর্থও পাদ্রী সাহেবকে দিতে হয়নি, জনৈক বাঙালি ভদ্রলোক ওই অর্থ দিয়েছিলেন। আজ নাম মনে করতে পারছি না। নীলদর্পণ নাটকখানি নিয়ে সিনেমা হয়েছিল। তাতে আদালতের ওই দৃশ্য ছিল। বইখানি আমি দেখেছি। এ তথ্য সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা ‘সেই সময়’ উপন্যাসে উল্লেখ আছে। উপন্যাসটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। আজ মনে করতে পারছি না কোন খণ্ডে উল্লেখ ছিল।

তাছাড়া বাংলাদেশের লেখক শেখ জহুরুল ইসলামে লেখা ‘মহাকবি মাইকেলে’ যাহা উল্লেখ আছে তুলে ধরছি, মধুসুদনের ‘নীলদর্পণ’ নাটক অনুবাদের মূলে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয়। নীলকর সাহেবরা প্রথমত বুঝতে পারেনি যে, মধুসূদন এই নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। পরে যখন বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন ইংরেজ নীলকর সাহেবরা নয়, ইংরেজ সরকারও মধুসূদনের ওপর সাংঘাতিক চটে গেল এবং ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে চাকুরিও ছাড়তে হল (মহাকবি মাইকেল পৃ. ৫২)। লেখিকা ওই তথ্য কোন পুস্তকে পেয়েছেন জানালে পাঠকমাত্রই উপকৃত হবেন।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ী নতুনপাড়া, কোচবিহার।

ড. রাধাকৃষ্ণান : শিক্ষক সত্তার কাছে রাষ্ট্রপতি সত্তা ম্লান

পরপর দু’বার উপরাষ্ট্রপতি থাকার পর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতে রাষ্ট্রপতি হলেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিশ্ববন্দিত অধ্যাপক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে শিক্ষক জীবনের সূচনা। তারপর মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সেখান থেকে চলে আসেন লন্ডনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে। স্বীয় মেধা মনীষা, বাগ্মিতা ও অধ্যাপনার গুণে বিদেশের মাটিতেও তিনি হয়ে উঠলেন সেরার সেরা। সেখান থেকে ৫ বছরের জন্য দেশে ফিরে এসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ সামলান। পাঁচ বছর পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে লন্ডন ফিরে যান সাম্মানিক Spoulding Professor-এর পদ অলঙ্কৃত করার জন্য। অধ্যাপক জীবনের শেষ নয়টি বছর তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে আসীন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। পরবর্তীকালে ভারতের হয়ে ইউনেস্কোতে প্রতিনিধিত্ব করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর দু’বার উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করে ভারতের রাষ্ট্রপতি হন।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বহুগুণের অধিকারী হয়েও, নানান সম্মানীয় পদ, এমনকী দেশের সর্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত করেও শিক্ষক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করতেন।

১৯৬২ সালে ড. রাধাকৃষ্ণন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হলেন। সেই বছর তাঁর গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ী বেশ কিছু ছাত্র বন্ধু ভক্ত ৫ সেপ্টেম্বর রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটি সাড়ম্বরে পালন করতে চাইলো। ড. রাধাকৃষ্ণন তাঁর জন্মদিন পালনের পক্ষপাতী কোনোদিনই ছিলেন না। তিনি ভক্তবৃন্দের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তাদের বললেন, ‘আমার জন্মদিন পালনের চেয়ে আমি গর্ব অনুভব করবো যদি ৫ সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে দেখা হয়।’

অক্লান্তকর্মা, স্থিতধী এই মানুষটি শুধু দার্শনিক, অধ্যাপক ও প্রশাসক হিসেবেই বিশ্বের নজর কেড়েছিলেন তাই নয় বাগ্মী ও লেখক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণগুলো আজ ইতিহাস। ভারতের সনাতন ধর্ম, বেদ, বেদান্ত গীতাকে তিনি জেনেছিলেন ভারত-আত্মারূপে। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, ঐতিহ্য ও তুলনামূলক দর্শনের উপর লেখা তাঁর বইগুলো আজও বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত।

—**অশোক কুমার ঠাকুর,**
কোচবিহার।

আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদ্মাসনা চতুর্ভুজা গুইনাইন দেবীর মূর্তি। পাশে মন্দিরের পুরোহিত।

চীনের প্রাচীন হিন্দু মন্দির

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশ

আমেরিকাস্থিত চীনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত 'হু শীহ' (১৮৯১-১৯৬২) একবার এক সভাতে বলেছিলেন, 'পুরাকালে ভারত একটি সৈন্য না পাঠিয়েও বিশ শতকের বেশি সময় ধরে শুধু চীনকে পরাজিতই করে রাখেনি, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল'। একথা শুনে সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতবাসীরই গর্ব হবার কথা। আর আজ আধুনিক চীন তার আগ্রাসী প্রচেষ্টায় শুধু তিব্বতই নয়, সমস্ত বিশ্বকেই গ্রাস করতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জি. জিং পিং গত বছর ২০ বিলিয়ন ডলার নিবেশ করেছেন সমগ্র আফ্রিকাতে। আজ এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপীয় বাজার চৈনিক সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আজ চীন ভারতকে 'মুক্তার মালা' নামক প্রকল্পের দ্বারা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে চাইছে।

কোন দেশে 'চায়না টাউন' নেই বলুন তো? মরিশাস, কানাডা আর আমেরিকার কথা ছেড়েই দিলে প্রায় প্রতিটি দেশেই আছে 'চীনা বাজার' থেকে 'চীনা গলি'। কলকাতার কথায় ধরুন না! 'চীনা বাজারের' জুতোর দোকানের সঙ্গে অপরিচিত এমন বাঙালি দুর্লভ। জানেন কি ট্যাংরায় চামড়া পাকানোর কারখানার পিছনেই আছে 'চীনে কালীবাড়ি'। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে চীনে পুরোহিত নিয়মিত মা-কালীর পূজা করেন।

পরম্পরা

শুনলে আশ্চর্য হবেন না তো, প্রাচীন চীনে হিন্দুমন্দির ছিল? শুধু ছিল না, আজও আছে। আর স্থানীয় চীনারা তার নিত্য পূজা করে আসছেন বহু শতাব্দী ধরে। এ প্রবন্ধের পাঠক যদি পশ্চিমবঙ্গ, কেরল অথবা ত্রিপুরাবাসী হন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন, এই তিন রাজ্যেই নিষ্ঠুর কমিউনিস্টরা অসহায় ও প্রতিরোধহীন হিন্দুদের শেষ আশ্রয়স্থল অর্থাৎ হিন্দু দেবদেবীর ধ্যানধারণা ও হিন্দু সংস্কৃতির ভিতটাকে মাত্র তিনদশকেই কীরকম প্ল্যান মাফিক আস্তে আস্তে ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্বর ইসলামিক শাসনের ৮০০ আর অত্যাচারী বৃটিশের ২০০ বছরের শাসনে সনাতন হিন্দু সমাজের যে ক্ষতিটা না হয়েছে, তার ১০০ ভাগ বেশি ক্ষতি সম্পন্ন হয়েছে কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের যৌথ উদ্যোগে মাত্র ৬৭ বছরের রাজত্বকালেই।

সে যাই হোক, ভারতের বাইরে বহু দেশের মতো প্রাচীন চীনেও একসময় অসংখ্য হিন্দুমন্দির ছিল। ভেবে দেখুন না আজও পৃথিবীর বৃহত্তম বিষ্ণু মন্দির 'ওঙ্কারভট' অবস্থিত আছে কম্বোডিয়ায়। মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও হিন্দু সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আর আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, চেয়ারম্যান মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক আক্রমণকে উপেক্ষা করে আজও বর্তমান রয়েছে 'গুয়ানঝাও' প্রদেশ প্রায় ডজনখানেক হিন্দুমন্দির।

আফগানিস্তানের তালিবানরা যেমন

চীনে প্রাচীন মন্দিরগাত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুপম নিদর্শন।

'বামিয়ান' বুদ্ধের মূর্তি তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে বা গত কয়েক মাসে আইসিস নামক ইসলামিক জিহাদিরা বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রতীক সিরিয়ার প্রসিদ্ধ 'পালমিয়ার' মন্দিরটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, ঠিক তেমনই প্রাচীন চীনেও ছিল অসংখ্য হিন্দুমন্দির যার কোনো অস্তিত্বই আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভাবতে ভাল লাগে, আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদ্মাসনা চতুর্ভুজা 'গুইনাইন' (চৈনিক ভাষায়) দেবীর পূজা 'চেডিয়ান' গ্রামের অধিবাসীরা কমিউনিজমের বস্তুতান্ত্রিক আক্রমণকে প্রতিহত করে আজও অব্যাহত রেখেছেন। দেবীর পদতলে ভূলুণ্ঠিত পরাজিত দানব আর মূল মূর্তির দু' পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দেবীর অন্য দুই রূপ অথবা তাঁর দুই সহচরীর মূর্তি। আমাদের দেশে আমরা দেবীকে বিভিন্নরূপে পূজা করি। আমরা হিন্দুরা যেমন দেবী চামুণ্ডার পূজা করি ধূপ-ধুনার সঙ্গে লাল জবাফুল দিয়ে, ঠিক তেমনিভাবেই চীনারা 'গুইনাইন' মায়ের পূজা করে 'চায়না রোজ' দিয়ে। কখনও ভেবে দেখেছেন কি জবাফুলের নাম কেন দেওয়া হয়েছে 'রোজ-চায়না'?

রোজ সকাল-সন্ধ্যায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে চৈনিক ভাষায় মন্ত্র পড়ে দেবীকে আবাহন করে। এটা কি নিছকই কাকতালীয় একটা সন্নিপাত, নাকি সত্যিই হাজার বছর ধরে প্রচলিত দেবীপূজার রীতি চীনে আজও সমান ভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে?

আমরা সবাই জানি, চীন হচ্ছে ভূমিকম্প প্রভাবিত অঞ্চল। 'চেডিয়ান' গ্রামও ভূমিকম্পের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। বৃদ্ধ গ্রামবাসী 'লি'-র অনুমান আজ থেকে ৫০০ বা তারও বেশি বছর আগে এক ভয়ানক ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষ থেকে

দশপ্রহরণধারী নৃসিংহ মূর্তি।

'গুইনাইন' দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেই সময় গ্রামবাসীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পুনরায় মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয় এবং নিয়মিত শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করার ফলে বর্ধিষ্ণু সেই গ্রামকে আর কখনই ভূমিকম্পের প্রকোপে পড়তে হয়নি।

এবার দেখুন নীচের ছবিটিতে, বিশাল মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে নিপুণ ভাস্কর্যের এক অনুপম নিদর্শন। আজও দক্ষিণ ভারতের যে কোনো শহরে গেলে অনুরূপ ভাস্কর্যের পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দুমন্দিরগুলিতে। দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা পৌরাণিক কাহিনিগুলি যেন সজীব হয়ে উঠেছে অমর শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে। চেডিয়ান গ্রামের আশেপাশের গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে আছে অসংখ্য হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। স্থানীয় চীনাদের ধারণা দেবী 'গুইনাইন' নাকি এসেছেন ভারত থেকে। পরবর্তীকালে তিনিই বোধহয় গৌতম বুদ্ধের অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের স্ত্রীরূপ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু 'গুণরত্নের' চৈনিক নাম হচ্ছে 'লিয়ান পুটন'। তার সময়েই বহু সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য চৈনিকভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

চৈনিক ইতিহাসকারদের মতে প্রাচীনকালে 'গুয়ানঝাও' প্রদেশে ছিল এক বিখ্যাত পোতাশ্রয়। ভারতের সঙ্গে চীনের নিত্যদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বহু পুরনো। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাড়ুর সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তামিল বণিকরা সদলে 'সাং' (৯৬০-১২৭৯) ও 'ইউয়ান' (১২৭৯-১৩৬৮) দুই রাজবংশের রাজত্বকালে 'গুয়ানঝাও' প্রদেশে ব্যবসা করতে আসতো প্রায় প্রতি বছর। সঙ্গে নিয়ে আসতো সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র, মশলা, ভেষজ ওষুধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধিদ্রব্য। সেই সময় তারা ওই হিন্দুদেবীর মূর্তি ও মন্দির স্থাপনা করে। আমিষভোজী স্থানীয় চীনাদের তুলনায় তারা ছিল নিরামিষ ভোজী। দুধ, দই, ভাতই ছিল তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য যা আজও দক্ষিণ ভারতের প্রধান খাদ্য বলে সুপরিচিত। হাজার বছরের পুরনো 'ফা হিয়েন' ও 'হিউয়েন সাং'-য়ের ঐতিহাসিক দলিলও সেই তথ্যের সাক্ষ্য বহন

করে। সে সময় 'গুয়ানঝাও' বন্দরটি ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডাঃ এস গুরুমূর্তির লেখা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, একসময় চীন (৩৮ শতাংশ) আর ভারতের (৩৩ শতাংশ) সারা বিশ্বের জি-ডি-পি-র প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভাগই আসতো বিশ্বের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ওই দুই দেশ থেকে। শুনতে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি ১৯৩০ সালে চীন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর এক নৃসিংহ মূর্তি— নর এবং সিংহের মিশ্রণে তৈরি দুর্দান্ত দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদীর্ণকারি ভগবানের দশভুজধারী 'নৃসিংহ' অবতার। সচরাচর আমরা চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দশ প্রহরণধারী ভগবান বিষ্ণুর মর্মর মূর্তি।

অয়াং লিমইং হলেন 'গুয়ানঝাও' প্রদেশের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার প্রধান অধ্যক্ষ। তাঁর মতে মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা সংস্কৃত বা পালি-লিপির মর্ম উদ্ধাকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। একাজ একমাত্র ভারত এবং চীন সরকারের পুরাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগেই সম্ভব হতে পারে। তখন আরও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধ্যান পাওয়া যাবে।

গুয়ানঝাও-য়ের প্রত্নতাত্ত্বিক, 'উ অয়েন লিয়াং'-য়ের মতে ভারতের বিশেষ করে প্রাচীন অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অধুনা তামিলনাড়ু প্রদেশের সঙ্গে চীনের গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল বহু শতাব্দী ধরে। হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস এবং তাও-ধর্ম স্থানীয় চীনাদের মধ্যে বিনা বাধায় পালিত হোত। তাদের মধ্যে ছিল না আধিপত্য বা প্রভুত্বের কোনো প্রতিযোগিতা বা রেশারেশি। ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান। ডাঃ সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর কথায় বলতে হয়, 'অতীতকালে চীনারা ভারতকে পুণ্য-ভূমি বা দেবতাদের আবাসস্থল বলে সম্বোধন করত। মা-বাপের মুখ উজ্জ্বল করা অথবা কালি-দেওয়া সন্তান সীতারাম ইয়েচুরিকে বলতে ইচ্ছা করছে, দেখুন, চেয়ারম্যান মাও-য়ের দেশের লোকেরাও ভারতকে সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি। আর আপনি

কিউয়ান শহরের বিখ্যাত শিবলিঙ্গ।

এবং আপনারা সেই মাতৃভূমির নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়ে, তার অন্নগ্রহণ করে এবং দেশ মাতৃকার অক্সিজেনে পরিপুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞের মতো মাতৃভূমির লাঞ্ছনা করতে কুণ্ঠিত হন না। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগের অনায্য দাবিকে সমর্থন জানিয়ে দেশটাকে বিভাজিত করেছিলেন। ১৯৬২ সালে আগ্রাসী চীনের ভারত আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন আপনারাই। প্রসঙ্গক্রমে মনে আসছে, নেহেরুভিয়ান সোশালিজমের পৃষ্ঠপোষক, দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী তকমা-বিশিষ্ট তথাকথিত ঐতিহাসিক অর্থাৎ নামজাদা বিপনকুমার, রোমিলা থাপার আর পক্ষপাতদুষ্ট ইরফান হাবিবের কথা। অতীতকালে ভারতীয়দের মতো চীনাদের উপর মুসলমানের বর্বর আক্রমণ কখনো হয়নি। চীন আক্রান্ত হয়েছে জাপানি ও ইউরোপিয়ানদের দ্বারা। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসকারী প্রভাব আর অভ্যন্তরীণ বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক সংগ্রামের অনির্বচনীয় অশুভ প্রভাব পড়েছিল চীনের উপর। আনুসঙ্গিকভাবেই চেয়ারম্যান মাও-এর পুরনো ঐতিহ্য বিরোধী তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগান্তকারী প্রভাব ছিল আধুনিক চীনের পটভূমি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'সং' রাজাদের সময়কার বিখ্যাত মন্দির 'ইয়ানফু'র দেওয়ালে পাথরের উপর খোদাই করা সংস্কৃত লেখা থেকে জানা যায়, অবিসংবাদিত ভাবেই হিন্দু বণিকদের চীনে আগমন এবং হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসার সেই প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত ছিল। শ্রীমতী উয়াং-য়ের মতানুসারে উন্নত হিন্দুধর্মের কালজয়ী প্রভাব অস্বীকার করার ক্ষমতা স্থানীয় চীনা ধর্মগুরুদের ছিল না। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, চীনের বিখ্যাত 'শাওলিন-কুংফু'র উৎসস্থলও নাকি ছিল ভারতই। সেটা নাকি ভারত থেকে আগত বৌদ্ধভিক্ষুদের এক অমূল্য দান ছিল যা চীনের জনতাকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রচার করা হয়েছিল। শুধু বিষ্ণু মূর্তিই নয়, কিউয়ান শহরের মধ্যে আছে কয়েক মিটার উঁচু এক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ। তাছাড়া নানাস্থানে ছোটবড় অনেক শিবলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার থেকে মনে হয় দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব চীনের অধিবাসীদের উপর যথেষ্ট পরিমাণেই পড়েছিল। উপরের ছবিটি দেখে মনে হয়, শিবের মাথায় জল ঢালা অবস্থায় বিশালকায় হাতি এবং শিবলিঙ্গ—এ যেন দক্ষিণী সভ্যতারই এক বিশেষ নিদর্শন।

এ প্রবন্ধের উপসংহারে আমেরিকার বিখ্যাত লেখক এবং চিন্তাবিদ মার্ক টোয়েনের উদ্ধৃতির আলোচনা না করে থাকতে পারছি না। তিনি লিখেছেন, 'ইন্ডিয়া হচ্ছে মানব জাতির শৈশবের দোলনা, সমগ্র বিশ্বের ভাষার জন্মস্থল, ইতিহাসের জননী, পৌরাণিক সভ্যতার মাতামহী এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রপিতামহী'।

(লেখক মরিসাস-এর এস এস আর মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক)

পুরাণের গল্প

নবাঙ্কুর

মান্ধাতার জন্ম

পুরাকালে শ্রাবস্তি নামে এক মস্ত বড় রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজার নাম যুবনাশ্ব। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কোষাগারে বোঝাই ধনরত্ন, পাত্র, মিত্র, সেনা, সেনাপতি সব আছে। তবু রাজার মনে সুখ নেই। কী করে থাকবে, রাজা তো অপুত্রক। অপুত্রক রাজার মনে কি সুখ থাকে? তাঁর ভারি চিন্তা, তাঁর পরে এই বিশাল রাজ্যের রাজা কে হবে, আর কেই বা রাজ্য শাসন করবে। গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন রাজা। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে একদিন ঠিক করলেন তিনি ঋষিদের কাছে গিয়ে তাঁর দুঃখের কথা জানাবেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। একদিন তিনি অরণ্য মধ্যে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর তাঁদের কাছে নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে বললেন, 'আপনারা মহাতপস্বী, অসাধারণ দেবশক্তি সম্পন্ন। আপনারাই আমার পুত্রলাভের উপায় বিধান করতে পারেন।'

রাজার অনুনয়-বিনয় শুনে মুনি-ঋষিরা নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর রাজামশাইকে বললেন, 'মহারাজ, একমাত্র উপায় হলো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা। এই যজ্ঞ করলে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র লাভ হবে।'

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে। যজ্ঞের জন্য আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন আমি সব পাঠিয়ে দেব। আপনারা যজ্ঞ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করুন।' সেই গভীর অরণ্যে ঋষিদের আশ্রম-প্রাঙ্গণে শুরু হলো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। রাজা প্রাসাদে অপেক্ষা করে আছেন কখন যজ্ঞ সমাপ্তির খবর আসবে। একদিন

দু'দিন তিন দিন কেটে গেল কিন্তু আশ্রম থেকে কোনো খবর এল না। শেষে রাজা আর ধৈর্য রাখতে না পেরে নিজেই খবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন।

অরণ্যের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মুনি-ঋষিদের আশ্রম প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই দিনই সবে যজ্ঞ শেষ হয়েছে। পরিশ্রান্ত ঋষিরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত রাজা দেখলেন ঠিক যজ্ঞকুণ্ডের পাশে একটা জলপূর্ণ মাটির পাত্র রয়েছে। তিনি এতই তৃষ্ণার্ত ছিলেন যে এক নিঃশ্বাসে পাত্রের সব জল পান করে ফেললেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে ঋষিদের জাগালেন। তাঁরা জাগ্রত হয়ে রাজাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। বললেন, 'মহারাজ, আজ অতি শুভক্ষণে আপনি এসেছেন। কিছুক্ষণ আগে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। আপনাকে একটি জলপূর্ণ পাত্র দেব, সেটি রাণীমাকে পান করতে বলবেন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।' এই কথা বলে রাজার হাতে জলের পাত্র দিতে গিয়ে দেখেন তাতে এক ফোঁটাও জল নেই। 'একি আশ্চর্য কাণ্ড! পাত্রের যজ্ঞাহুত জল কোথায় গেল?' চিৎকার করে উঠলেন ঋষিরা।

রাজা শুনে কাতর হয়ে বললেন, 'আমিই ওই পাত্রের জল পান করেছি। খুবই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম আর আপনারা নিদ্রিত ছিলেন তাই...'। ঋষিরা রাজার কথা শুনে হায় হায় করে উঠলেন। তাঁরা রাজাকে বললেন, 'আপনি একি করলেন! ওই যজ্ঞাহুত জল রাণীমা পান করলে তাঁর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মাত। এখন রাণীমার পরিবর্তে আপনাকেই ওই সন্তান ধারণ করতে হবে।'

রাজা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। ঋষিদের কাছে অনেক কাকুতি- মিনতি করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ঋষিরা বললেন, 'ওই জলের ক্ষমতা আটকায় এ জগতে এমন কেউ নেই। যা হবার তাই হবে।'

রাজা বিষণ্নমনে রাজধানীতে ফিরে এলেন। কিন্তু রাজসভায় না গিয়ে প্রচার করলেন যে তিনি খুবই অসুস্থ। অন্তঃপুরের একটি ঘরে গোপনে বাস করতে লাগলেন।

এই ভাবে দশ মাস দশ দিন কেটে যাবার পর রাজবৈদ্যকে ডেকে রাজার পেট কেটে পুত্রের জন্ম হল। রাজাও ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

সবই তো হলো, এখন এই শিশুপুত্র কার দুধ পান করবে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে নেমে এসে বললেন, এই ঘটনা বিশ্বে বিরল। আমিই এই পুত্রকে দৈববলে দুধ পান করিয়ে রক্ষা করব। আমার জন্যই এ বাঁচবে— 'মাং ধাতা'।

দেবরাজ ইন্দ্রের সেই উচ্চারিত 'মাং ধাতা' থেকেই রাজপুত্রের নাম রাখা হলো মান্ধাতা। তারপর মান্ধাতা বড় হলেন। রাজা যুবনাশ্ব তাকে সিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে গেলেন। আর মান্ধাতা রাজা হয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন।

প্রশান্ত সেন

মনীষী কথা

ডাঃ হেডগেওয়ার

পরাধীন ভারতে রাষ্ট্র পুনর্জাগরণে এক অভিনব চিন্তার বীজ বপন করেছেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি ভেবেছেন স্বাভিমানী রাষ্ট্র তৈরি করতে হলে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই কাজ করার জন্য ১৯২৫ সালে শুরু করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে একটি সংগঠন। যে সংগঠন মানুষ তৈরির মাধ্যমে শক্তিশালী দেশ গঠনের কাজ করে চলেছে। ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্ম ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল। বর্ষপ্রতিপদ তিথিতে। মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেশভক্ত ছিলেন। নাগপুরে পড়াশুনা শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন ডাক্তারি পড়তে। এখানে এসে যোগ দেন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতিতে। সমিতিতে তাঁর ছদ্মনাম ছিল কোকেন। ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি নাগপুর ফিরে যান কিন্তু ডাক্তারি করেননি। সারাজীবন তিনি হিন্দুসমাজ সংগঠনের কাজ করেন। তাঁর জীবন আদর্শ ভারতের যুবসমাজের কাছে প্রেরণার।

লিখে পাঠাও

দেবী দুর্গা আসছেন, সঙ্গে আসছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। সবাইকে নিয়ে কেমন এই **দেবীর সংসার**। ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাতে হবে আমাদের ঠিকানায়। সেরা লেখাটি প্রকাশিত হবে নবাঙ্কুরের পাতায়।

দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পাঠানো যাবে।

ছবিতে অমিল খোঁজ

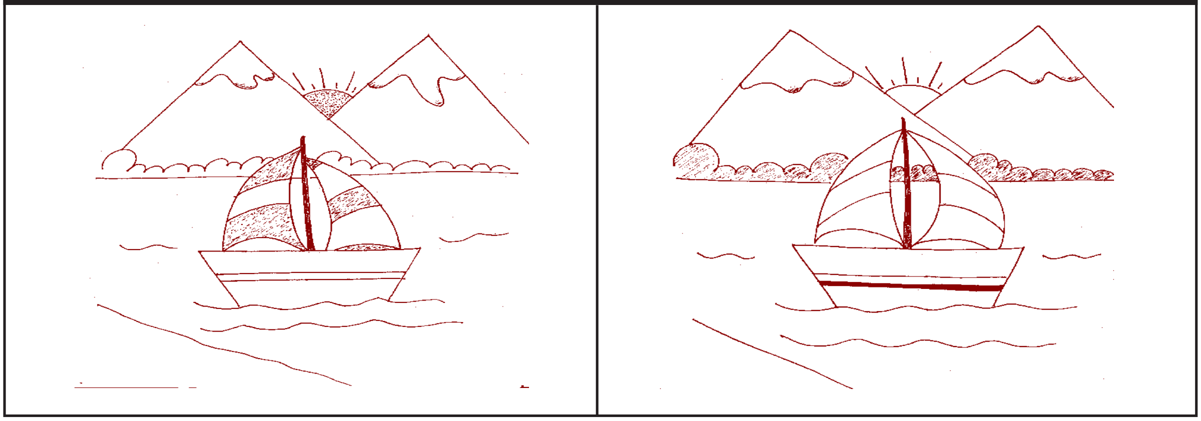

ছোটদের কলমে

নিধু রায়ের সংসার

সাগ্নিক চৌধুরী, বসিরহাট, পঞ্চম শ্রেণী

বামুন পাড়ার নিধু রায়
রোজ সকালে কোথায় যায়?
বাওড় পাড়ের শেষ প্রান্তে;
কলমি শাক আর নাল আনতে।
নাল-কলমি নিয়ে নিধু
বাজারেতে যায়—
সবকিছু সে বিক্রি করে
তিরিশ টাকা পায়।
কখনও সে তাঁত বোনে
কখনও করে পূজা;
মাঝে মাঝে রামায়ণ গায়,
আর কবির তরজা।
একমাত্র মেয়ে তার
সেভেনেতে পড়ে।
কালীদাসী স্ত্রী তার,
সারাদিন কাজ করে।
ভক্তঘরের মানুষ ওরা
করে একাদশী;
খুব গরিব হলেও ওরা
থাকে হাসি খুশি। ■

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

ছোট ও বড় পর্দায় নারী

শবরী ঘোষ

বিনোদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন। নিরক্ষর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত, বাড়ির পরিচারিকা থেকে শুরু করে চিকিৎসক, অধ্যাপক কিংবা অভিজাত ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে গ্রাম-শহরের আট থেকে আশি'র অধিকাংশ মানুষই এই দু'টি মাধ্যমের অনুরাগী। ১৯৪৭ সালের পূর্বে যে ছায়াছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে তার অনেকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যান মহাকাব্য বা ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে ভিত্তি করে নির্মিত হোত। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে অমর স্বাধীনতা সংগ্রামী, চীন-ভারত যুদ্ধ এবং তার পাশাপাশি ভারত তথা বিশ্বের বহু বিখ্যাত সাহিত্যকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এখানে এই জাতীয় ছবি যে হয় না তা নয়, তবে সেগুলি মূলত ব্যতিক্রমী। সব থেকে খারাপ দিক চলচ্চিত্রে ভারতীয় নারীকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় সেই বিষয়টা।

অঙ্গনা

হিন্দি ও বাংলার অধিকাংশ ছবিতেই নায়িকার ভূমিকা কার্যত 'শো পিসে'র। তবে নারীকেন্দ্রিক সিনেমা বাংলা বা হিন্দীতে হলেও প্রযোজক পরিচালকরা ততটা আগ্রহ নয় এক্ষেত্রে, কিন্তু নারীকেন্দ্রিক সিনেমা যেমন— মেরিকম, মরদাঙ্গি বা কুইন-এর সাফল্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দর্শক কতটা আগ্রহী। ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বাণিজ্য সফল ছবি 'পিকে'। ছবিটির শিল্পমূল্য সম্পর্কে এখানে আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে ছবিটি দেখার পর মনে হয়েছে নায়িকার চরিত্রটি এখানে প্রায় অপ্রয়োজনীয় ছিল। সাংবাদিক চরিত্রটি নারী না হয়ে পুরুষের হলেও ইতরবিশেষ হোত না। কে জানে! প্রবল হিন্দুবিরোধী মনোভাব দেখানো সত্ত্বেও হিন্দুবিদ্বেষীরা হয়তো ছবিটি দেখবে না এই ভয় থেকে পরিচালক একজন গ্ল্যামারাস সাংবাদিকের চরিত্র আমদানি করেছেন। সলমন খানের ১০০ বা ২০০ কোটি টাকার বাণিজ্য করা 'দাবাং', 'দাবাং ২' বা হালের 'বজরঙ্গী ভাইজান' ছবিগুলিতে নায়িকার বিশেষ কিছু করার ছিল না। প্রশ্ন জাগে, এই ছবিগুলিতে তাহলে নায়িকার ভূমিকা কী? কিছুটা প্রসাধন লাগিয়ে নায়কের সঙ্গে নাচগান করা! তবু হয়তো ছবিগুলিকে বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু ভাট প্রযোজনার ছবিগুলি তো একেবারে অসহ্য! যেমন অশ্লীল নায়িকাদের পোশাক-আশাক, তেমনই কুরুচিকর ছবিগুলির বিভিন্ন দৃশ্য। মেয়েদের কি এঁরা কেবলমাত্র পণ্য বলে মনে করেন? কোনো সন্দেহ নেই নারীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধগুলির পশ্চাতে এই জাতীয় ছবিগুলি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ইদানীং এঁরা আবার দেশি নায়িকা ছেড়ে বিদেশি নায়িকাদের নিয়ে ছবি করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। যে দেশে ভারতীয়দের বিশেষত হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচার চলে সেই দেশের অভিনেত্রীকে নিয়ে এত নাচানাচি কেন? দেশে কি নায়িকার আকাল পড়েছে! নাকি ওই অভিনেত্রীরা ওই দেশগুলির সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে বিরাট কোনো ভূমিকা নিয়েছেন? অথবা প্রথম সারির নায়িকারা ওই ধরনের যুক্তিহীন প্রায় পর্ণোগ্রাফি মার্কা ছবিগুলিতে অভিনয় করতে চাইছেন না বলে এই পদক্ষেপ?

বেশিরভাগ সিনেমার নায়িকাকে গ্ল্যামারসর্বস্ব পুতুল হিসাবে না দেখিয়েও কিন্তু ভাল ছবি করা যায়। বাংলা ছবি 'আসা যাওয়ার মাঝে', 'বেলাশেষে' , 'মুক্তধারা', 'রামধনু', হিন্দি ছবি 'কহানি', 'কুইন' অথবা 'দৃশ্যম্' এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। 'মেরি কম' ছবির অলিম্পিক পদকজয়ী বক্সার চরিত্র, 'মুক্তধারা'র নৃত্যশিল্পীর চরিত্রগুলি বহু মেয়েকে প্রেরণা দেবে। আবার ঘরোয়া তথাকথিত অতি সাধারণ মেয়েদের চাওয়া-পাওয়া, মূল্যবোধ তুলে ধরেছে রাজশ্রী প্রোডাকশনের পারিবারিক ছবিগুলি। এগুলোও তো বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, অপরিণতবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মনে ছায়াছবির একটা বিরাট প্রভাব আছে। সেগুলি দেখে কি মেয়েরা অশ্লীল পোশাক পরা, গালাগালি দেওয়া (আজকাল কিছু 'স্মার্ট' ছবিতে মেয়েদের মুখে অশ্রাব্য সংলাপ থাকে), সিগারেট বা মদ্যপান করা শিখবে? চলচ্চিত্রকাররা কিন্তু এই অবক্ষয়ের নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না। ছোটপর্দার কিছু ধারাবাহিকের অভিনেত্রীরাও আজকাল কুরুচিকর পোশাক পরছেন। ছায়াছবির অনুকরণে সেখানেও চটুল 'আইটেম ডান্স' এবং অশ্লীল দৃশ্যের ছড়াছড়ি। পাশাপাশি খলনায়িকারা রোজনামচার কাজকর্ম ছেড়ে কেবলমাত্র রান্নাঘরের রণনীতি নিয়েই ব্যস্ত! সত্যিই কি আজকের দিনে সংসারী মহিলারা দিনেদুপুরে অমন উগ্র প্রসাধন ও ডিজাইনের পোশাক পরে সব কাজ ছেড়েছুড়ে কেবল বউমা, জা, বউদি বা ননদকে কীভাবে জব্দ করবেন তা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন? যদি থেকেও থাকেন তবে তাঁদের উৎসাহ দেওয়া কি গণমাধ্যমের কাজ! কেন্দ্রীয় সরকার কেন কিছু পর্ণ সাইট বন্ধ করে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করল বলে গালাগালি দিচ্ছেন তাঁদের কাছে এ নিয়ে কি প্রতিবাদই বা আশা করা যায়!

একটি পারিবারিক মিলন

আর এস এস-বিজেপি'র সম্পর্ক এক অন্য ধারার, যে কোনো ধাঁচায় একে খাপ খাওয়ানো যায় না

অতিথি কলম

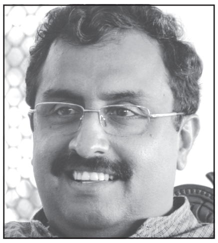

রাম মাধব

সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ ও সহযোগী সংগঠনগুলির তিন দিনের সম্মেলন ঘিরে যথেষ্ট কৌতূহল ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতি বাড়তি উত্তেজনা ও ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নানান সমালোচনার জন্ম দেয়।

আর এস এস একটি বিশাল ও জনপ্রিয় সংগঠন। তাই একে ঘিরে কৌতূহল ও আগ্রহ থাকার কারণ বোঝা যায়। কিন্তু সমালোচনার ঝড় তোলার কি কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে? গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কোনো সংগঠন কি সরকারের সদস্যদের সঙ্গে ভাবনার আদান প্রদান করতে পারে না? বাস্তবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যেরা দৈনিক নানান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক সংস্থার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে থাকেন। এটি তাঁদের প্রায় দৈনিক রুটিনের মধ্যে পড়ে। তাই যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে এত অসন্তোষ বা গলা ফাটানো কেন?

> **দুনিয়ায় কোনো রাজনৈতিক দল পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত দু'টি মডেলকে অনুসরণ করা হয়। একটি ইংল্যান্ডের শ্রমিক পার্টি মডেল যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলিই দলের নেতৃত্বকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয়টি চীনা কমিউনিস্টদলের মডেল যেখানে দলই যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে সরকার, সাংস্কৃতিক সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন কিছুই দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে না। এই দু'টি মডেলের ধাঁচায় ফেলে আর এস এস-কে বুঝতে চাইলে ভুল হবে।**

কিছু কিছু সমালোচকদের দৃষ্টিতে আর এস এস সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বহুক্ষেত্রেই বিজেপি-র উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আর এস এসের যোগাযোগ কিন্তু সর্বজনবিদিত এবং প্রধানমন্ত্রী দ্বারা ঘোষিত। তাঁর দলেরও তাই। হ্যাঁ 'সঙ্ঘ পরিবার' আসলে অনেকগুলি সংগঠনের মিলনে একটি পরিবার। আর তুল্যমূল্য বিচারে এই পরিবার একটি আদর্শের ধারক পরিবার। সেই সুবাদে আর এস এসের সঙ্গে বিজেপি-র আলাপ আলোচনায় কোনো নতুনত্ব নেই। আর এমন নয় যে এই প্রথম একটি সম্মেলন হলো। বিগত এনডিএ জমানাতেও ২০০৩ সালে এমনই একটি তিন দিনের সম্মেলন হয়েছিল। তখনও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবানি বা মুরলীমনোহর যোশী সমেত আরও বহু মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনটিও প্রভূত কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তখন যেটা ছিল না তা হলো আজকের মতো আক্রোশ।

পরিস্থিতি বিচারে আর এস এস নেতৃবৃন্দ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে এই দেখা-সাক্ষাৎ কিন্তু কোনোভাবেই সরকারের কাজকর্মের কৈফিয়ৎ চাওয়া নয় বা মন্ত্রীদের বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড পেশ করা নয়। আর এস এসের পক্ষ থেকে কোনো পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে এমন ধারণার প্রচার সযত্নে পরিহার করা হয়। আর এস এসের সরকার্যবাহ (জেনারেল সেক্রেটারি) শ্রী ভাইয়াজী যোশী দ্বর্থ্যহীনভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে এই সম্মেলন কখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ নয়। সেই কারণে সভায় মন্ত্রীদের সকলের শেষে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করা হয় যাতে কোনোভাবেই আলোচনার মধ্যে তাদের কাজকর্মের নিরীক্ষণ করার কোনো অবকাশ না থাকে।

তবু ভবি ভোলবার নয়। কিছু অতি পণ্ডিত সমালোচক অংশগ্রহণকারী মন্ত্রীদের ওপর সরকারি গোপনীয়তা রক্ষার শপথ ভঙ্গের মতো চরম হাস্যকর অভিযোগ আনেন। এটি সত্যিই ন্যক্কারজনক। মন্ত্রীরা কত শত রকমের সম্মেলনে যোগ দেন। আবার দিনের শেষে তারা বাড়িও ফিরে যান। সেখানে নিজেদের পরিবার, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে নৈশ আহার করেন। এর মানে কি দাঁড়ায় তাঁরা সরকারি গোপনীয়তার আইন ভঙ্গ করেছেন? প্রত্যেক দলই তাদের সভা করে এবং সেখানে তাদের সমমনোভাবাপন্ন সংস্থাদেরও ডাকা হয়। অনেক সময় মন্ত্রীরা এমনকী প্রধানমন্ত্রীও তাতে অংশ নেন। বহু ক্ষেত্রে সেটা ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হতে পারে, কখনও মহিলা শাখার আলোচনা সভাও হতে পারে, আবার কখনও বা যুব কর্মীদের ডাকা কোনো সম্মেলনও হতে পারে। এমন আরও অনেক শাখা সংগঠনের সঙ্গেই মন্ত্রীদের মত বিনিময় হতেই পারে।

এর মানে কি এই দাঁড়ায় যে তাঁরা সরকারি ফাইল বগলদাবা করে সেখানে যাচ্ছেন?

এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমি এই সমালোচকদের তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারছি না। তাঁরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই কংগ্রেস দল তো সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা ভোগ করার জন্য কুখ্যাত। মনে পড়বে ইউপিএ-১ এর সময় একটি 'জোক' খুব চালু ছিল। ভারতে তখন ৩ জন প্রধানমন্ত্রী বা পিএম— একটি সরকারি, একটি অতি সরকারি (সুপার পিএম) আর একটি সিপিএম। ইউপিএ-২-এর সময় দেশ সিপিএম-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়, কিন্তু সুপার প্রাইম মিনিস্টার দ্বিগুণ মহিমায় বিরাজ করতে থাকেন। তিনিই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পেছন থেকে নিতেন। তাই এই বিষয়ে যতই অতীত ঘাঁটা যাবে ততই সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার কাদাজলে চারদিক থৈ থৈ করবে।

পরিতাপের বিষয়, বহু কংগ্রেস সদস্য সেই আমলগুলিতে এক্তিয়ার বহির্ভূত ও প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ নিয়ে নিজেরাই বহু চিঠিপত্র লেখালিখি করেছিলেন। ব্যাপারটা খুলে বলাই যাক, ইন্দিরা ও মনমোহন জমানার প্রবীণ মন্ত্রী নটবর সিং-এর ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে ইন্ডিয়া টুডে-তে লেখাটির প্রসঙ্গ। পিভি নরসিংহ রাও তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি একদিন সকালে ৭নং রেসকোর্স রোডে তাঁর আবাসে নটবরকে ডাকলেন। নটবর পৌঁছনোর পর সকাল নটা নাগাদ পিভি ঢুকলেন। নটবর লিখেছেন, ''আমি সচরাচর পিভিকে কখনও বিচলিত হতে দেখি না। সেদিন দেখলাম তিনি যেন কেমন অস্থিরচিত্ত একইসঙ্গে বিক্ষুব্ধ। পিভি বলেন, আমি এই মাত্র তাঁর একটা চিঠি পেয়েছি। নটবর বললেন, আমি কিছু পাইনি। তবে তিনি জানতেন রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে ম্যাডামের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তুমুল মতবিরোধ হচ্ছে। কিন্তু এর পরই পিভি আমাকে যা বললেন তাতে আমি একেবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি আর তাঁর সঙ্গে পারছি না। সরকারিভাবে আমি পারতাম, কিন্তু আমি তা করব না। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে কী আশা করেন।

নটবর বললেন, তুমি একবার দেখা কর না ম্যাডামের সঙ্গে।

আরে আমি কতবার আর তাঁর সঙ্গে দেখা করব? এটা একজন প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। তাঁর ব্যবহারে আমার শরীর খারাপ করছে। আর কতবার আমি অপমান হজম করব?" এই গেল সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার তুরীয় কেচ্ছা। মনমোহন সিং-ও তাঁর ছেলের হাতে হয়েছেন।

সোনিয়া গান্ধী কিন্তু তখন কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন না, নরসিংহ কিন্তু ছিলেন। বলতে লজ্জা হয়— ভারতের এই প্রধানমন্ত্রীর ওপর সোনিয়ার ঘৃণা এতটাই তীব্র ছিল যে অনেকেরই স্মরণে থাকবে তিনি মারা যাবার পর তাঁর শবদেহ কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে পর্যন্ত ঢোকানো হয়নি। তাঁর মরদেহ কার্যালয়ের দরজায় মিনিট ২০ রাখা ছিল শোক জ্ঞাপন করার জন্য। ঘৃণার উৎসার চরমে ওঠে যখন দেখি রাজধানী দিল্লীতে তাঁর দেহ সৎকার করতে দেওয়া হয়নি। আর তিনিই হলেন দেশের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যাঁর নামে দিল্লীতে একটিমাত্রও স্মৃতিফলক নেই। সঞ্জয় গান্ধীরও একটা অন্তত আছে।

যাই হোক, আবার আর এস এস-বিজেপি সমীকরণে ফিরে যাই। উভয়ের সম্পর্ককে একটি পটভূমিতে বিচার করতে হবে। 'দি ব্রাদারহুড ইন স্যাফ্রন' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ওয়াল্টার অ্যান্ডারসন বেশ চিত্তাকর্ষক একটি পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। ''The RSS is very difficult to understand & very easy to misunderstand"।

আজকের দুনিয়ায় কোনো রাজনৈতিক দল পরিচালনার ক্ষেত্রে মূলত দু'টি মডেলকে অনুসরণ করা হয়। একটি ইংল্যান্ডের শ্রমিক পার্টি মডেল যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলিই দলের নেতৃত্বকে পরিচালিত করে থাকে। দ্বিতীয়টি চীনা কমিউনিস্টদলের মডেল যেখানে দলই যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে সরকার, সাংস্কৃতিক সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন কিছুই দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে না। এখন এই দু'টি মডেলের ধাঁচায় ফেলে আর এস এস-কে বুঝতে চাইলে ভুল হবে।

আর এস এস-এর মডেলটি সর্বার্থেই অন্যরকমের। এর আওতায় ৪০টি সংগঠন আছে যারা এই বৃহত্তর পরিবারের অঙ্গ। আর এস এস হচ্ছে এই সংগঠনগুলির আদর্শগত উৎস। চলতি ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বলতে হয়, আর এস এস তাদের কখনই নিয়ন্ত্রণও করে না, আদেশও দেয় না। ঠিক ভারতীয় বৃহৎ পরিবারগুলির মতো তারা সকলে মাঝে মাঝে একসঙ্গে মিলিত হয়ে ভাব বিনিময় করে। এর মধ্যে কতকগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি বিশেষভাবে আর এস এস-এর ভাবধারার অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ও শ্রদ্ধার; যেমন— (১) দেশের নিরাপত্তা (এর মধ্যে বিশেষ করে কাশ্মীর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের সুরক্ষা), (২) অর্থনীতি (বিশেষ করে স্বদেশীর প্রসঙ্গ), (৩) সামাজিক মেলবন্ধন (তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নে বিশেষ যত্ন নেওয়া) এবং (৪) শিক্ষা (এক্ষেত্রে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়)। যে কোনো সাংগঠনিক সভায় এই বিষয়গুলির ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়। বিজেপি নেতারা ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন, এই পারিবারিক মিলন সভায় অংশ নেন, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। সাম্প্রতিক সম্মেলনটিও এর বাইরে কিছু নয়। মন্ত্রীরা তাঁদের দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করে গেছেন। তা কি সব সংগঠনের কার্যকর্তা বা ধ্যান-ধারণাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? তা নিশ্চিত করে কখনই বলা যায় না। ১০০ শতাংশ সন্তুষ্টি আশা করা দুরাশা।

তবে বহু এমন সম্মেলনের অতীত সাক্ষী হিসেবে আমি দাবি করতে পারি যে এবারের মিলনেও পরিবারের সদস্যরা তাঁদের আদর্শগত বন্ধনের ক্ষেত্রে দেশের মন্ত্রীদের দেশ নির্মাণের প্রত্যয়ে সন্তুষ্টচিত্তেই বাড়ি ফিরেছেন। আমার এটাও মনে হয়েছে, বাড়ির লোকেদের এই মন জয় করতে পারাটা সরকারকে তাদের ভবিষ্যৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।

(লেখক বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন-এর ডাইরেক্টর)

অর্থনীতিকে দিশাহীন করে দিতেই ভারতে জালনোট ঢোকাচ্ছে পাকিস্তান ভায়া বাংলাদেশ

বাসুদেব পাল ॥ ১৯৭১ সালে ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় বাংলাদেশ এক নতুন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়। দুই দেশের মধ্যে শাসক বদলের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কেরও উত্থান- পতনও ঘটে চলেছে।

ভারত মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের বাংলাভাষীদের জাতীয়তার স্ফুরণ এবং নবজাগরণে সর্ববিধ সহায়তা করেছে। এই সহায়তা যে কতটা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপালন এবং কতটা পাকিস্তানের ভারত-বৈরিতার যথাযথ জবাব দেওয়ার কারণে তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য। যেমন এককোটি বাংলাদেশি (পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানবাসী)-কে একবছরের বেশি ভারত ফুডিং-লজিং দিয়েছে, তেমনি সামরিক সাহায্য দিয়ে সহায়তা করেছে। সেদিন থেকে আজ অবধি ভারত বাংলাদেশকে আর্থিক সহযোগিতা করে চলেছে। কট্টর মুসলমান-বিরোধী বলে বহুনিন্দিত ভারতীয় জনতাপার্টি ও তাদের নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থ তো বটেই, উপরন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত (স্থল সীমান্ত চুক্তি ২০১৫) সমস্যার তথাকথিত সমাধানের জন্যে ভারতের কিছু এলাকা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে তুলে দিতেও পিছপা হননি। এহ বাহ্য। এবার দেখা যাক বাংলাদেশ ভারতের বিবিধ প্রকার অবদানকে কীভাবে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ শুধু নয়, সাবেক পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে অনবরত মুসলমান অনুপ্রবেশকারী, হিন্দু উদ্বাস্তু এবং জেহাদি পাঠিয়ে চলেছে। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে এইচ এম এরশাদ, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া থেকে বর্তমানের শেখ হাসিনা ওয়াজেদ পর্যন্ত কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। খালেদা ও হাসিনার মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রবল বিরোধ থাকলেও কখনও কোনো বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী একবারও স্বীকার করেননি যে, ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে বা একজনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করেছে। অথচ এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে। লাগোয়া বিহার, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার প্রতি দশ বছর অন্তর জনস্ফীতির গ্রাফ বা রেখাচিত্র দেখলেই বোঝার অসুবিধা হবে না। এই লেখার বিষয় এটা নয়। যেটা বর্তমান বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করতে পারেনি, সেই বিষয়ে আলোচনা করলে বাংলাদেশের ভারত-বন্ধুত্বের কষ্টিপাথরে নয়, সাদা চোখে অনুমান করতে কারোরই অসুবিধা হবে না বলে মনে হয়।

মালদা সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হওয়া জালনোট (ফাইল চিত্র)।

একেবারে আসলের মতো হুবহু দেখতে জালনোট যা ব্যাপকহারে পাকিস্তানে তৈরি হয়ে ভায়া বাংলাদেশ ভারতে অবাধে ঢোকানো হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার— ভারতের অর্থনীতিকে নীতিহীন দিশাহীন বল্গাহীন করে দেওয়া। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভালো মতন জানে তারা কোনোদিনই ভারতকে সামরিকভাবে পরাস্ত বা কোণঠাসা করতে পারবে না। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত সরকারের বাজেটের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয় ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে। সীমান্ত আবার সর্বত্র সমতল নয়, পর্বত-নদী-নালা-জঙ্গল ও বরফ ঢাকা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরের (৫-৬ জুন, ২০১৫) সময় প্রধানমন্ত্রীস্তরে আলোচনার সিদ্ধান্ত মতো গত ১২ আগস্ট যৌথ টাস্কফোর্সের (১২ জন সদস্য) বৈঠক হয়েছে চারদিনব্যাপী। বৈঠকে ভারত থেকে ২০০৮-এ গঠিত ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এন আই এ)-র কর্তারা যোগ দিয়েছিলেন। এন আই এ বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশকে যে তথ্য দিয়েছে আর প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশ যে তথ্য দিয়েছে তা ভারতের এক দৈনিকের বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি মৌসুম আকনের পাঠানো প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে। মৌসম আকন বাংলাদেশের নাগরিক, ওদেশেই থাকেন। পেশার খাতিরে কিছু কথা প্রকাশ করেছেন মাত্র। এটাকে জালনোটরূপী হিমশৈলের উপরিভাগ বলা যেতে পারে। পাকিস্তান ১৯৭১-এর যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ার পর প্রক্সি-ওয়ার এবং ১৯৯৯ কারগিল পরবর্তীতে ভারতের ভিতরে জেহাদি ফিদাইন (আত্মঘাতী হামলা) ও সহায়ক হিসেবে জালনোট ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়াতে জোর দিয়েছে। দুটোরই প্রবেশপথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ ও

ভারত-নেপাল স্থল-সীমা এবং গুজরাটের ভারত-পাক জলসীমা। প্রথমদিনের জালনোট সম্পর্কিত টাস্ক-ফোর্স বৈঠকে এন আই এ-র কর্তারা বলেছেন, বিগত এক বছরে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মালদা সীমান্ত দিয়েই দেড় হাজার কোটি টাকার জালনোট ভারতে ঢোকানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশকে ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করেছে। এটা আর আজকে বলার দরকার পড়ে না যে, এই ট্রানজিট রুটের বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশই সম্যকরূপে ওয়াকিবহাল। যদি তা না হয় তাহলে নেতা ও গোয়েন্দারা কপট দিবানিদ্রায় সযত্নে শায়িত বলা ভুল হবে না। বিশেষ সূত্র অনুযায়ী, ভারতব্যাপী জালনোট ছড়িয়ে দিতে কমপক্ষে কুড়িটি এজেন্সি কাজ করছে। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা ওই সকল এজেন্সি দেখভাল করার জন্য মাথায় বসিয়েছে কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিমকে। কুড়িটি নেটওয়ার্কের মধ্যে ছয়-ছয়টি রয়েছে মালদায়। জালনোট আছে ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার। এন আই এ-সূত্রমতে সম্প্রতি ৫০০ কোটি টাকার জালনোট পাকিস্তানের সরকারি প্রেস থেকে ছাপিয়ে ভারতে চালান করা হয়েছে। নেপাল, বাংলাদেশ-সহ কয়েকটি দেশ থেকে বিমানে 'কূটনৈতিক ব্যাগ' সীল মেরে তার মধ্য দিয়ে জালনোট পাঠানো হচ্ছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাবি ভারতীয় নোটে এমন চারটি চিহ্ন রয়েছে যা জাল করা অসম্ভব। অর্থাৎ মোট ১৪টি চিহ্নের মধ্যে দশটি জাল করা সম্ভব বলে মেনে নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, পাকিস্তানে ছাপা জালনোটের সঙ্গে আসল নোটের পার্থক্য বোঝা প্রায় দুষ্কর। বেশিরভাগ উন্নত দেশ তাদের নোটে ১৮টি চিহ্ন সুরক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করে। বাজারে ঢুকে পড়া নোটের পরিমাণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও আই বি-র সমীক্ষা মতে বাজারে জালনোটের পরিমাণ দু'হাজার কোটি টাকার মতো। জালনোট নিয়ে এন আই এ-র পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট দিয়ে বাজার সমীক্ষা করানো হয়েছে। ওই সমীক্ষার পর এন আই এ-র হাতে জালনোট ঢোকানোয় পাকিস্তানের এজেন্সিগুলির হাত রয়েছে বলে বেশ কিছু প্রমাণ এসেছে। আই এ-র মতে— জালনোট তৈরির জন্য যে ধরনের কালি কাগজ দরকার তা সাধারণের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। একমাত্র টেন্ডার ডেকে ওইরকম কালি-কাগজ পাওয়া যেতে পারে। আর একাজ করতে পারে একটা স্বাধীন দেশ। পাকিস্তান চাইছে একদিকে জালনোট ছড়িয়ে ভারতের অর্থব্যবস্থাকে অস্থির করে দিতে। অপরদিকে জঙ্গি জেহাদি ঢুকিয়ে ভারতের স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিতে। ভারতের মধ্যে পাক- জঙ্গিরাও ঢুকছে ব্যাপক পরিমাণে জালনোট সঙ্গে নিয়ে। বিভিন্ন দেশে দাউদ কোম্পানির এজেন্ট রয়েছে। ওই এজেন্টদের আবার সাব- এজেন্ট রয়েছে। দাউদের এজেন্টদের কাজ হচ্ছে সাব-এজেন্টদের কাছে জালনোট পৌঁছনো। পাকিস্তানকে জালনোট পাচারে সাহায্য করতে দাউদের এজেন্ট রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, দুবাই এবং নেপালে। জালনোট ছাপা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়— পাকিস্তানের সরকারি প্রেসে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে খবর, পাকিস্তান প্রথমে জালনোটের বেশিরভাগই বিমানের তথাকথিত 'কূটনৈতিক ব্যাগ' ছাপ দেওয়া ব্যাগে ভরে বিদেশের এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ-সহ অন্যান্য দেশের বিমান থেকে নামানো জালনোটের ব্যাগে কূটনৈতিক চিহ্নের ছাপ থাকছে। ফলে ব্যাগ নিয়ে কারও সন্দেহ থাকছে না। গোয়েন্দা সূত্র অনুসারে, জালনোট সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতে পাচার করা হচ্ছে। কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে গড়ে উঠেছে জালনোটের এক একটি চক্র। নেপাল থেকে জালনোট ভারতে ঢুকছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত দিয়ে। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, মির্জাপুর এবং বেতিয়াতে গড়ে উঠেছে জালনোট কারবারিদের বেসক্যাম্প। বাংলাদেশ থেকে জালনোটের সিংহভাগই ঢুকছে মালদা জেলাতে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের লালগোলা, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা দিয়েও জালনোট চলে আসছে ভারতে। নেপাল বর্ডারে কড়া নজরদারির জন্য পাক গুপ্তচর সংস্থা জালনোট পাচারে মালদা জেলাকে বেশি করে ব্যবহার করছে। মালদার কালিয়াচক, মোজমপুর, মহব্বতপুর এবং বৈষ্ণবনগর সীমান্ত দিয়েই জালনোট ঢুকছে ভারতে। গত বছর এবং চলতি বছরে জালনোট উদ্ধারের অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে মালদা জেলা জড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারমধ্যে দশজনই মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে আসলে জালনোটের ক্যারিয়ার-রা। এবছর বেশ কিছু বিদেশি নাগরিকও ধরা পড়েছে একই অপরাধে। মামলা চলছে। বিদেশিদের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিক। ভারতীয় গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশেও দাউদ কোম্পানির কয়েকজন এজেন্টকে জালনোট-সহ গ্রেপ্তার করেছে বিদেশের পুলিশ। জালনোটের সঙ্গে মাদকদ্রব্য চালানোর কাজটাও পাক-মদতে দাউদ কোম্পানি চালিয়ে যাচ্ছে। একহাতে জালনোট, অন্য হাতে মাদকদ্রব্য--- এই দুই নিয়ে দাউদ-এজেন্টরা ব্যবসা ফেঁদেছে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকেও ব্যবসায়ীরা বা তাদের প্রতিনিধিরা জালনোট কিনতে আসছে আসল টাকার বিনিময়ে। গোয়েন্দা সূত্রমতে, মালদার বৈষ্ণবনগর থানার এক গ্রামের নাম দুইশতবিঘি। ওই গ্রামেই রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া যা জালনোট পাচারের অন্যতম করিডর। দুইশতবিঘি থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে চাইপাড়া-মোহনপুর-সুখপাড়া। দুই গ্রামে মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে অতি সম্প্রতি দুই ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ নিয়ে জালনোট কিনতে এসেছিলেন। কিনে নিয়েও গিয়েছেন। একজনের কাপড়ের ব্যবসা, অন্যজনের হোটেল ও ক্যাটারিং। ব্যবসার জন্য তাঁরা আসেননি। তাদের কোনো আত্মীয়স্বজনও মালদায় নেই। নিয়ে গেছেন ৫০০ ও ১০০০ টাকার জালনোট। সব টাকার জালনোটের দাম আসল টাকায় ৩০ থেকে ৫০ এর মধ্যে। সি আই ডি-র দাবি, মালদার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগরের বহু গ্রামের বাসিন্দারা জালনোটকে তাদের একমাত্র পেশা করেছে।

জয় হবে বিহারবাসীর

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এরই মধ্যে ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভার প্রথম পর্যায়ের ভোট পড়ে যাবে। রাজনীতির পারদ তুঙ্গে। জোরকদমে চলছে প্রচার, পালটা প্রচার আর রাজনৈতিক তরজা। প্রধান দুই প্রতিপক্ষ প্রায় সমানে সমানে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। শুধু বিহারবাসীরাই নয়, গোটা ভারত এই মহাসংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি দেখার জন্য উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছে। যথেষ্ট কারণও রয়েছে। লড়াইটা হচ্ছে বকলমে ইউপিএ এবং বিজেপি-র মধ্যে। নীতিশ-লালু-কংগ্রেসের 'মহাজোটবন্ধন' প্রকারান্তরে ইউপিএ জোটেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। যেহেতু এই জোটের নেতা এবার নীতিশ কুমার এবং বাম-সহ জোটের আরও কিছু শরিক আলাদাভাবে লড়ছে, তাই ইউপিএ নাম ব্যবহারে কৌশলগতভাবে কিছু অসুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে, নামে এনডিএ জোট হলেও সেখানে মূলশক্তি হলো বিজেপি। প্রত্যাশিতভাবেই এই জোটের নেতা নরেন্দ্র মোদী। আগ্রহটা ইউপিএ-এনডিএ লড়াইকে নিয়ে নয়; কেননা তার স্মৃতি এখনও মানুষের মনে টাটকা অবস্থায় রয়েছে। আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হলো ২০১৪ সালের 'মোদীঝড়'-এর শক্তি এখনও কতটা টিকে আছে আর মহাজোটবন্ধনের নেতা নীতিশ কুমার সেটাকে প্রতিহত করতে পারেন কিনা তা পরখ করার। বিজেপি-র কাছে এই নির্বাচন শক্তি পরীক্ষার হলেও, লালু-নীতিশের কাছে তা অস্তিত্ব রক্ষার। গত লোকসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও সংযুক্ত জনতা দলের যে করুণ পরিণতি হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি মানেই তাদের কাছে গঙ্গাপ্রাপ্তির সমতুল্য। অন্যদিকে, ১৯৯৫ সালের নির্বাচন থেকেই বিজেপি বিহারে তাদের শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। ২০০৫ সাল থেকে টানা দু'বার তারা নীতিশ কুমারের সঙ্গে সরকার গড়েছে। বর্তমানে তাদের সাংগঠনিক শক্তি সংযুক্ত জনতা দলের থেকে কোনো অংশে কম নয়। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম ও কেরলের নির্বাচনে বিহারের

> "এই প্রথম রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিসরে জাতপাতের পরিচয়কে ছাপিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের দিকটি বড় হয়ে উঠল যা শুধু বিহারই নয়, সার্বিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক।"

জয় যে তাদের বাড়তি মনোবল যোগাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মূলত বিজেপি-র জোটসঙ্গী হয়েই বিহারের ক্ষমতায় নীতিশ কুমারের উত্থান। একসময় লালুর 'জঙ্গলরাজ' শেষ করতে বিজেপি তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। বিজেপি-র সঙ্গ ত্যাগ করায় রাজনৈতিকভাবে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এবার সেই ভূতই তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাঁর হাল এতটাই করুণ হয়েছে যে তিনি বিজেপি-কে ঠেকাতে তাঁর জাতশত্রু লালুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অন্যদিকে, ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভেঙ্গে দিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ। গত লোকসভা ভোটের ঠিক আগে দাগি সাংসদ লালুপ্রসাদকে বাঁচাতে মনমোহন সরকারের আনা অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার ডাক দেন রাহুল গান্ধী, যার জেরে পশুখাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায় লালুর। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসকে উৎখাত করার প্রধান প্রবক্তা জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের হাত ধরে লালু-নীতিশের রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ। এবার সেই কংগ্রেসও তাঁদের জোটে। এক কথায়, যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নীতিশ কুমার নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী দলগুলিকে নিয়ে মহাজোটবন্ধন গড়েছেন। অশুভ শক্তির এই জোটকে বিহারবাসী জনতা কীভাবে নেয় সেটাও এবার দেখার পালা। অন্যপক্ষে বিজেপি-র চিন্তা জাতপাতের সমীকরণ। বিহার রাজনীতিতে ক্ষয়িষ্ণু আর জে ডি ও যতই দুর্বল হোক না কেন, নীতিশের দলের সঙ্গে জোট বেঁধে তারা যে যথেষ্ট শক্তিশালী তার প্রমাণ সাম্প্রতিক অতীতে বিজেপি পেয়েছে। লালু প্রসাদের যাদব-মুসলমান, নীতিশের কুর্মি-মহাদলিত এবং কংগ্রেসের সবশ্রেণীরই সামান্য কিছু ভোটের যোগফল বিজেপি-কে যথেষ্ট বেগ দিতে পারে বলে মনে হচ্ছে। জাতপাতের অঙ্কে বিজেপিও খুব একটা পিছিয়ে নেই। রামবিলাস পাসওয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি, উপেন্দ্র কুশওয়ার রাষ্ট্রীয় লোকসমতা পার্টি এবং জিতনরাম মাঝির মতো অনগ্রসর নেতাদের দলও এনডিএ-তে রয়েছে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই নরেন্দ্র মোদীর পাঁচটি প্রাক-নির্বাচনী জনসভার আয়তন আর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে বিজেপি নেতৃত্ব আশাবাদী যে বিহার জয় নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, নীতিশ কুমার ততই জমি হারাচ্ছেন। বিজেপি সামগ্রিকভাবে রিপোর্ট পাচ্ছে যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যাজিক সংখ্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে দল। কিন্তু এতো গেল নির্বাচনের হিসাব।

অন্য পিঠে ভোটসর্বস্ব বিহার ঐতিহাসিকভাবে দেশের গরিব রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। শিল্পের অভাব, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, শিক্ষার হার অত্যন্ত কম, কাজের খোঁজে শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া, অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— অনুন্নত অর্থনীতির সব বৈশিষ্ট্যই সেখানে উপস্থিত। বিহারে মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের এক পঞ্চমাংশ। মাথাপিছু গড় ব্যয়ও জাতীয় গড়ের থেকে অনেক নীচে। রাজ্যের মোট উৎপাদন মূল্যের মাত্র ১৭ শতাংশ আসে শিল্প থেকে। অলাভজনক কৃষির উপর নির্ভরতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষকই ভূমিহীন যাতে সৃষ্টি হয়েছে চরম দারিদ্র্য আর আংশিক বেকারত্ব। এর সরাসরি প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিম্নহারের শহরায়নে যা জাতীয় হারের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। জনস্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি যে শিশুমৃত্যু ও গর্ভকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার জাতীয় হারের থেকে অনেকটাই বেশি। পাঁচ বছরের নীচে ৮৮ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে ৪০ শতাংশ শিশু কম ওজনের হয়। প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ আজও কাঠ, ঘুঁটে, কেরোসিনে রান্না করেন এবং অর্ধেকের চেয়ে বেশি মানুষ অস্থায়ী কাঁচাঘরে বাস করেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে আজ মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ৩৮ শতাংশ মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছয় না আর নারী সাক্ষরতা মাত্র ৫২ শতাংশ যা দেশের মধ্যে নিম্নতম। কোনো মতে পেট বাঁচানো নাচার এই মানুষগুলিকে নিয়ে সহজেই সেখানে চলে জাতপাত আর বিভাজনের রাজনীতি।

এবারও মহাজোটবন্ধনের নির্বাচনী প্রচারের শুরুটা অসম্পূর্ণভাবেই ছিল জাতপাতের রাজনীতি। লালুর নির্বাচনী বক্তব্যের মূলসুর ছিল তাঁর গতে বাঁধা মণ্ডলতত্ত্বকে ফের চাগিয়ে তোলা। এমনকী নীতিশ কুমারও নিষাদ ও মল্লা সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় তফশিলি উপজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জিগির তুলেছেন। কিন্তু প্রচারের অভিমুখটা বদলে দিলেন খোদ নরেন্দ্র মোদী। আজ বিহারবাসীর যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো বিপুল অর্থ সাহায্য আর তাঁদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা। এমতাবস্থায় বিহারবাসীর দুর্দশা ঘোচাতে কে বা কারা সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারবেন সেটাই তাদের মূল আগ্রহের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। যত সরল তাঁরা হোন না কেন, এই নির্ভেজাল সত্যটা তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে জাতপাতের আনুগত্যকে মাথায় রেখে ও ভোট দিলে আবার তাঁদের চূড়ান্ত সর্বনাশেরই কারণ হবে। আর এই বাস্তবতাটা বোঝেন বলেই হয়তো লালুকে বদলে একদিন তাঁরা নীতিশকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। অথচ এই সত্যটা নীতিশ কুমার বেমালুম ভুলে গেছিলেন। কেনই বা নরেন্দ্র মোদীর বিহার উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণার পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হলো এ প্রশ্ন আজ বিহারবাসীর মনে উঠতে বাধ্য। যাইহোক, আগামী পাঁচবছর কার উপর তাঁরা ভরসা রাখবেন তা তাঁরাই ভাল বুঝবেন। কিন্তু একথাও স্পষ্ট যে আগামী দিনগুলিতে বিহারের রাজনীতির অভিমুখটি জাত-পাতের রাজনীতির বদলে উন্নয়নের মন্ত্রই হতে চলেছে। এই প্রথম রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিসরে তাঁদের জাতপাতের পরিচয়কে ছাপিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের দিকটি বড় হয়ে উঠল যা শুধু বিহারই নয়, সার্বিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক। এবার যদি এন ডি এ জোট ক্ষমতায় আসে তবে তাঁরা পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন। আর যদি মহাজোটবন্ধন ক্ষমতায় আসে তবে তাঁদের আর জাত-পাতের রাজনীতিতে ফিরে যাবার পথ থাকবে না। তাই পরিশেষে একথা বলাই যায় যে ভোটে যে কেউ জিতুক, আসল জয়টা হবে বিহারবাসীর যার কারিগর হিসেবে একশোভাগ কৃতিত্বের দাবিদার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি। ■

মেডিসিন বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মেডিসিন বাবা। এই নামটার সঙ্গে আজ অনেকেই পরিচিত। তাঁর আসল নাম ওঙ্কারনাথ শর্মা। দিল্লীবাসী তাঁকে 'মেডিসিন বাবা' নামেই চেনে। কারণ তাঁর কাজ বাড়ি বাড়ি ঘুরে অতিরিক্ত ওষুধ সংগ্রহ করে তা গরিবদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিলিয়ে দেওয়া।

পেশায় ছিলেন নতুন দিল্লীর বেসরকারি ব্লাডব্যাঙ্কের একজন দায়িত্ববান কর্মী। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বাড়িতেই দিন কাটছিল তাঁর। কিন্তু ২০০৮ সালে তিনি অবসর জীবনকে পিছনে ঠেলে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কারণ এই বছরই পূর্ব দিল্লীতে মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার জন্য কাজ শুরু হয়। কাজ চলাকালীন নির্মীয়মান সেতু ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলে ২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, বহু শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষ আহত হন। তা দেখেই

ওষুধ সংগ্রহে ব্যস্ত ওঙ্কারনাথ শর্মা (মেডিসিন বাবা, বাঁ দিকে)।

তিনি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সমস্ত শ্রমিকদের বাড়িতে থেকে চিকিৎসা চালাবার মতো আর্থিক অবস্থা নেই। তাই নিজেই মুশকিল আসান করতে তৎপর হন। শুরু করেন কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। পরণে তাঁর গেরুয়া রঙের কুর্তা। সামনে এবং পিছনে 'মেডিসিন বাবা' এবং ফোন নম্বর লেখা। গত সাত বছর ধরে প্রতিদিন সকাল ৬টায় বেরিয়ে দিল্লী শহরের বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে তিনি ওষুধ সংগ্রহ করছেন। সেই সমস্ত ওষুধ বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এনজিও, নানান দাতব্য ক্লিনিক এবং বিভিন্ন রোগীর মধ্যে বিলিয়ে দেন। তবে তিনি ৭৫ বছর বয়সে যে কাজটি প্রতিদিন করে থাকেন তা খুবই কষ্টকর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আজও করে চলেছেন। ওঙ্কারনাথের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন এক পথ দুর্ঘটনায় দু'টি পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এখনো তিনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এই অবস্থাতেই তিনি প্রতিদিন ৬ কিলোমিটার হাঁটেন। নিজের আর্থিক অবস্থাও ততটাই সঙ্গিন। বাড়িতে স্ত্রী ও ৪৫ বছরের বিকলাঙ্গ পুত্র। তাদেরও দেখভাল ওঙ্কারনাথ শর্মাকেই করতে হয়। নিজের পরিবারের সঙ্গে সমাজকে কাঁধে তুলে নিয়ে দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন এই বৃদ্ধ।

নতুন দিল্লীর পালমে মঙ্গলপুরির বস্তিতে বাস তাঁর। এরই একটি অংশে ওষুধ বিলির কাউন্টার খুলে বসেছেন তিনি। প্রতিদিন ওষুধ সংগ্রহ করে এনে এখানেই জমা করেন। এরপর তিনি ওষুধের নামের তালিকা, কবে তৈরি হয়েছে এবং কবে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, সর্বোপরি সেই ওষুধ কার থেকে, কবে, কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা সবকিছু তথ্য নথিভুক্ত করার পর বিলির কাজ শুরু করেন। কষ্টসাধ্য এই কাজে তিনি দিল্লীর মেট্রো রেলে যাতায়াত করতে পারেন না। কারণ মেট্রোর যা ভাড়া তা তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই বাসে এবং যেখানে বাস পৌঁছয় না সেখানে পায়ে হেঁটে যান। ক্লান্ত অবস্থায় এই বৃদ্ধ মানুষটিকে অনেকেই চা কিংবা জল এগিয়ে দিলে সেই ব্যক্তিকে হাসিমুখে 'না' বলেন মেডিসিন বাবা। কারণ তিনি বলেন, 'আমি ওষুধ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছি, চা জল খেতে নয়। তাই ওষুধ ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।' প্রতি সপ্তাহে একলাখের মতো ওষুধ সংগ্রহ করেন মেডিসিন বাবা। হঠাৎ এরকম কাজ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ওঙ্কারবাবু জানান, 'গত ২৭ বছরের চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, আমি এরকম বহু রোগীকে দেখেছি যারা টাকার অভাবে একটি পেনকিলার বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধও কিনতে পারেনি। মানুষ ওষুধ কেনেন কিন্তু অতিরিক্ত ওষুধ কাজে না লাগলে ফেলে দেয় বা মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। আমি সেই সমস্ত ওষুধই সংগ্রহ করে যারা কিনে উঠতে পারে না তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিই।

ওঙ্কারনাথের এই ওষুধ-ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ রোগের ওষুধ, ইনসুলিন ইঞ্জেকশন এবং ক্যানসারের ওষুধে ভর্তি। পুরো কাজটাই তিনি এতদিন একা হাতে সামলে এসেছেন। তবে আজ অনেকেই তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। মেডিসিন বাবার ইচ্ছা, প্রতিটি রাজ্যেই যদি একজন করে এগিয়ে এসে ওষুধ সংগ্রহের কাজে হাত লাগান তাহলে বিনা ওষুধে কাউকে মরতে হবে না।

মেডিসিন বাবার ফোন নম্বর : ০৯২৫০২৪৩২৯৮।

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact

DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945

RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

‘জগজ্জ্যোতি’-বৌদ্ধদের গবেষণাধর্মী পত্রিকা

পুস্তক প্রসঙ্গ

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন— ‘Buddhism–the Fulfilment of Hinduism.’ বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার এবং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হিন্দুদের উপাস্য। ভগবান বুদ্ধের মতে, ‘ধর্ম্মদানং সব্বদানং বিনোতি’ —ধর্মদান সকল দানের সেরা। তাই বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের প্রথম মিশনারি ধর্ম। আমরা বৌদ্ধ না হয়েও ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের জন্য গর্ববোধ করি।

মুসলমান আক্রমণ ও নৃশংস অত্যাচারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় অবলুপ্ত সেই বৌদ্ধধর্মের বর্তমান অবস্থা কী? এডুইন আর্নল্ড-এর ‘Light of Asia’ গ্রন্থের হাত ধরে এবং উনবিংশ-বিংশ শতকের বাঙালি মনীষীদের সাহায্যে বুদ্ধদেবের বাণী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। বৌদ্ধধর্ম পুনরায় জেগে উঠল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ মুখার্জী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও সিংহলের ভূমিপুত্র অনাগরিক ধর্মপাল এবং সে যুগের বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও মনীষীর আলোচনা ও গবেষণায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেল।

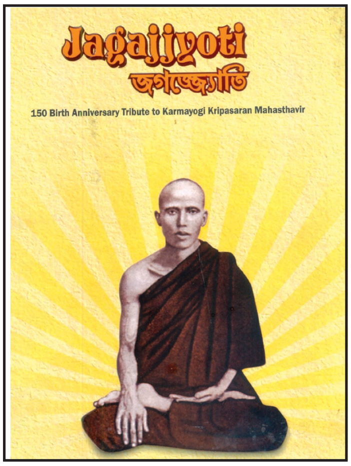

সেদিন বৌদ্ধধর্মের মরাগাঙে যেসব বাঙালি মনীষী জোয়ার এনেছিলেন তাদের মধ্যে অনন্যসাধারণ এক মহাপুরুষ ছিলেন কৃপাশরণ মহাস্থবির নামে এক বৌদ্ধসন্ন্যাসী। অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার (পটিয়া উপজেলা) উনাইনপুরায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২ জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দমোহন বড়ুয়া, মাতা আরাধনা দেবী। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে কৃপাশরণ কলকাতায় আসেন এবং কর্ম শুরু করেন। সে কর্মযজ্ঞ যেমন ব্যাপক তেমনি বহুমুখী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা’ স্থাপন ও সেই সভার মুখপত্র রূপে ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। এই উভয় কার্য বাঙালি-বৌদ্ধসমাজে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকা মূক-নীরব বাঙালি বৌদ্ধকে বাঙ্ময় করে তোলে। তার সঙ্গে বাংলার সুধী সমাজ বুদ্ধচর্চা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চায় নিমগ্ন হন। সে যুগের সমস্ত বাঙালি মনীষী এই ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা স্থাপন ও ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে কৃপাশরণ বাঙালি-বৌদ্ধদের অবজ্ঞার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছেন। সেই ঐতিহ্যশালী ‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকাটি কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর বিশাল-বিচিত্র-বহুমুখী প্রতিভাময় কর্মজীবন নিয়ে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করেছে। এটি একটি বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাটিতে ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কর্মযোগী কৃপাশরণের বিচিত্র কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অবাক হতে হয় যে, একজন প্রথাগত শিক্ষাবিহীন ব্যক্তি শুধু অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে কী বিশাল কর্মযজ্ঞের কী বিপুল আয়োজন করেছিলেন। আজ তাঁর ধর্মাঙ্কুর সভা মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে। ‘জগজ্জ্যোতি’ আজ সত্যই জগতের জ্যোতি হয়ে উঠেছে। তাঁর কার্যকলাপ সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমরা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি অতি অল্পই জানি। অত্যধিক অল্প জানি নিজেদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে। যা হোক, কৃপাশরণের অনলস প্রচেষ্টা সাধারণ বাঙালির মধ্যে কীভাবে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি সত্য-শিব-সুন্দর ধারণা গড়ে তুলেছে তা এই গ্রন্থপাঠে জানা যায়। কৃপাশরণের পাণ্ডিত্য, ধীশক্তি, আত্মত্যাগ, সরলতা, ধৈর্য, কর্মকুশলতা, নিষ্ঠা এক কথায় মহামানবের সকল গুণের সমাহার আমাদের বিস্মিত করে। তিনি বাঙালির গর্ব। কোনো ধর্মের শৃঙ্খলে তাঁকে; তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে বেঁধে রাখা যায় না। একদিন সমগ্র বিশ্ব তাঁর জন্য গর্ব অনুভব করবে।

‘জগজ্জ্যোতি’ পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের জন্য সম্পাদক শ্রী হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই। এই সংখ্যার লেখকদের সহজ-সরল-জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি রচনার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। কর্মযোগী কৃপাশরণ তো বটেই, তার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বহু তথ্য ও তত্ত্ব এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারলাম। এক কথায় গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্মের বিয়য়ে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের রূপ। সর্বোপরি সুবিশাল গ্রন্থটি পড়তে পড়তে একটুও ক্লান্তি বোধ হয় না। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা অতি সুন্দর। কোনো ভুল বানান অর্থাৎ মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েনি। গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক বর্গের উপর পরম করুণাময় ভগবানবুদ্ধের ও কৃপাশরণ মহাস্থবিরের করুণাভরা ও আশীর্বাদ শ্রাবণের ধারার ন্যায় ঝরে পড়ুক— এই প্রার্থনা করি।

Jagajjyoti ▯ **জগজ্জ্যোতি**— Bauddha Dharmankur Sabha (Bengal Buddhist Association). 1 Buddhist Temple Street, Kolkata-700012. Rs. 300.

ফঃ ৫

সমাবেশ সমাচার

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০ আগস্ট সমাজসেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা কলকাতায় কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত সহ মোট ৪১ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সহ-সচিব গুরুশরণ প্রসাদ। সভায় ২০১৫-'১৬ সালের পরিচালন সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি— শিবদাস বিশ্বাস, সহ-সভাপতি— ডাঃ ধীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী, অলোক

মুখার্জি, সাধারণ সম্পাদক—সন্দীপ পাল, সহ-সম্পাদক— কমল চ্যাটার্জি, সহ-সম্পাদিকা— শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ— পিনাকী পাল, কার্যালয় সম্পাদক— শঙ্করলাল সরকার, সদস্য— রাজকুমার ঝাঁ, প্রদ্যোৎমল বসু, সঞ্জয় বসু, ডাঃ সনৎ বসুমল্লিক, সদস্যা— শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল। উপদেষ্টামণ্ডলী— গুরুশরণ প্রসাদ, সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ মুখার্জি।

আমতায় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

হাওড়া জেলার আমতায় গত ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সংস্কৃতভারতী'র আমতা শাখার ব্যবস্থাপনায় সংস্কৃতভাষায় কথা বলার জন্য অনুষ্ঠিত হয় প্রথম 'সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির।' দু'টি শিবিরের একটি খড়িয়প ঋত্বিক গোষ্ঠী ক্লাবে ও অপরটি আমতা সরস্বতী শিশুমন্দিরে। সকালে ও বিকালে দু'টি শিবিরে প্রায় ৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। দশ দিনের এই সম্ভাষণ শিবিরে শিক্ষাদান করেন কমলাকান্ত মিস্ত্রী। গত ১০ সেপ্টেম্বর দু'টি শিবিরের মিলিত সমাপ্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় আমতা পাবলিক লাইব্রেরির সভাগৃহে। ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃতভাষায় নাটক, গীত, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলেন। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য দিব্যেন্দু চক্রবর্তী ও অতিথি ছিলেন সমাজসেবী শিবশঙ্কর বেজ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। সকল বক্তাই সংস্কৃত পঠন পাঠনের উপর গুরুত্ব দেন। উপস্থিত সকলেই সপ্তাহে একদিন নিয়মিত সংস্কৃত চর্চা করবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

বহরমপুরে জন্মাষ্টমী উদযাপন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে বহরমপুরের ভারতমাতা মন্দিরের উদ্যোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান দু'দিন ব্যাপী উদযাপিত হয়।

৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল। এছাড়াও বক্তা ছিলেন গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সেবা প্রমুখ দিলীপ ঝাওয়ার। ওই দিন কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় শিশুরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ছিল নৃত্য প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের শেষে সপ্তর্ষী নাট্যগোষ্ঠীর নাটক 'পাষাণ প্রতিমা' মঞ্চস্থ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমাপন সমিতির সম্পাদক অরিন্দম বিশ্বাস ও শ্রীমতী পল্লভা গোস্বামী। ওই দিন সন্ধ্যায় বনবাসী মায়েদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্রহ্মপুর জেলা সম্পাদক দিনেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও দুর্গাবাহিনী প্রমুখ শ্রীমতী কৃষ্ণা দাশের উপস্থিতিতে নতুন শাড়ি প্রদান করা হয়।

বলাগড়ে জন্মাষ্টমী উৎসব

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (বলাগড়) এবং অরুণাশ্রম সেবা সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। প্রভাতফেরি, গীতাপাঠ, কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে সারাদিন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং সেবা সঙ্ঘের কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অরুণাশ্রম সেবা সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি কুবের প্রসাদ জয়সোয়াল।

অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবনা সম্বন্ধে শ্রোতাদের অবহিত করেন 'স্বস্তিকা' পত্রিকার ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী।

প্রায় ৬০০ কৃষ্ণভক্ত দুপুরে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

হলদিয়ায় বি এম এস এসের বিশ্বকর্মা পূজা ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

হলদিয়ার ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের হলদিয়া, কলকাতা পোর্ট ও ডক শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে স্থানীয় কার্যালয়ে শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলা সঙ্ঘচালক অধ্যাপক কৃষ্ণগোপাল দাস অধিকারী। পূজামণ্ডপের পাশেই পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বনবাসী নৃত্যের আয়োজন করা হয়।

হিন্দী দিবস সমারোহ

গত ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে পুস্তকালয়ের সভাগৃহে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে হিন্দী দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে প্রখ্যাত কবি ড. শেরজংগ গর্গ, প্রধান অতিথিরূপে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. করুণা পাণ্ডে এবং প্রধান বক্তারূপে ড. রাহুল অবস্থী উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ওমপ্রকাশ মিশ্র বিভিন্ন কবির কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠান

পরিচালনা করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের মার্গদর্শক যুগলকিশোর জৈথলিয়া। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের 'কিষাণ দিবস' উদযাপন

গত ১ আশ্বিন ভাদ্র শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে কৃষিদেবতা ভগবান শ্রীবলরামের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কিষাণ দিবস পালিত হয় গত ১৯ সেপ্টেম্বর। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ব্লকের কালেঘাঁ তলাতে ২৫ বৎসর উপলক্ষে বিশাল উৎসব এবং বাউল সংকীর্তন সহকারে শ্রীবলরামের জীবন কাহিনি বর্ণনা করা হয়। ব্যবস্থায় ছিলেন স্থানীয় শচীন রায়, চৈতন্য দাস ও কার্যকর্তাবৃন্দ। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সহ-জেলা প্রচারক বিশ্বজিত দাস, কিষাণ সঙ্ঘের প্রদেশ সম্পাদক অরুণ রায়। জামালপুর ব্লকে আরাশুল গ্রামে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ মণ্ডল। কিষাণ দিবস কেন তার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, কিষাণদের অধিকার আদায়ের জন্য কিষাণদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কেন্দ্র সরকার ধানের নির্ধারিত মূল্য ১৪১০ টাকা ঘোষণা করেছে। ওই দামে কৃষকরা যেন ধান বিক্রি করতে পারেন তার সংকল্প করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কল্যাণপুর গ্রামে স্বদেশ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় উৎসাহপূর্ণ কার্যক্রম হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি নন্দলাল কাট।

উত্তর দিনাজপুরের মহেশপুর গ্রামে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি স্বদেশ ঝা চক্রবর্তী। দক্ষিণ দিনাজপুরে বদলপুর, সুতইল করদহ গ্রামে সারাদিনে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ হয়। উপস্থিত ছিলেন অধীর দাস। জলপাইগুড়ি জেলায় মোহিতনগর, ধূপগুড়ি ও ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে উপস্থিত ছিলেন মহেশ বর্মণ, কার্তিক বিশ্বাস ও নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। দার্জিলিং জেলার কালিংপং-এর ডুংরাবস্তিতে ও সিকিমের রাণীপুলে উৎসব পালিত হয়। ওই কার্যক্রমে শ্রী ভানুথাপা উপস্থিত থেকে পাহাড়ের কিষাণদের আরো বেশি জৈবিক চাষের সুপরিণাম হিসাবে স্বাস্থ্য, জমিরক্ষা, পরিবেশ রক্ষার ও অল্পজলের দ্বারা ভাল চাষ কীভাবে সম্ভব তার বর্ণনা করেন। বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি গ্রামে অরুণ মণ্ডল, দেমুশ্যা গ্রামে করুণা হাজারী, রায়পুরে জানকীনাথ মণ্ডল, বাঁকুড়া শহরে অজিত বারিক উপস্থিত ছিলেন। মোলবেনা গ্রামে কিষাণ দিবস পালন করা হয়।

বর্ধমান জেলার সওয়াই গ্রামে অমল ঘোষ, রণজিৎ ঘোষ, একচাকা প্রভাত মণ্ডল, অনিল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরুলিয়া বাদে সমস্ত জেলায় কিষাণ দিবস পালিত হয়। কৃষি দেবতা ভগবান বলরাম মূর্তির সামনে কিষাণরা সংকল্প গ্রহণ করেন। আগামীতে উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্যের দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিডিও, ডিএম-এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

ইআইএমএফ-এর শিক্ষক দিবস উদযাপন

গত ৫ সেপ্টেম্বর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার্স ফোরাম প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও তার কলকাতাস্থিত কার্যালয়ে শিক্ষক দিবস উদযাপনের আয়োজন করে। এই সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগঠনের সব সদস্য এবং সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সোনালিকা সেন। শিক্ষক

সবার প্রিয়
বিল্বদা ®
চানাচুর
'বিল্বদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভুম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

দিবসের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন চারজন স্বনামধন্য মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী শিবাশিস দত্ত। ওই দিনের সর্বশেষ নিবেদন ছিল শিবাশিস দত্তের সংবর্ধনা। তাঁকে পুষ্পস্তবক, পুষ্পমাল্য, শাল এবং উত্তরীয় দ্বারা সম্মানিত করা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির ভিডিও রেকর্ডিং করে ওয়ান আই মুভিজ সংস্থার পক্ষে পুষ্পা দেবনাথ।

রাজ্য বিজেপি-র মহিলা আইনজীবী সম্মেলন

গত ১২ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে রাজ্য বিজেপি-র মহিলা আইনজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় লিগাল এবং লেজিসলেটিভ সেলের সহ-আহ্বায়ক কামারসুবালা সুব্রহ্মণ্যম, রাজ্য লিগাল এবং লেজিসলেটিভ সেলের আহ্বায়ক সমীর পাল, বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য লিগাল সেলের সহ-সভাপতি পূরবী সাহা দাস, চান্দ্রেয়ী আলম্ প্রমুখ। এদিন মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পূরবী সাহা দাস। তারপর একে একে ভারতমাতা, দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ভগিনী নিবেদিতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নেই।' পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে মহিলাদের দুরবস্থা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সমীর পাল, চান্দ্রেয়ী আলম, সুকুমার বন্দোপাধ্যায়, পূরবী সাহা দাস। সমীর পাল মহিলাদের আরো বেশি করে বিচারবিভাগ, আইন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলেন। আদালতে মহিলা আইনজীবীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। শ্রীমতী আলম রাজ্যের ক্ষমতাসীন টিএমসি সরকারের অত্যাচার ও অনাচারের ফলে সৃষ্ট 'কালচারাল গ্যাপ' থেকে মানুষকে তুলে ধরে আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করতে, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে লিগাল সেলকে এগিয়ে আসতে পরামর্শ দেন। 'গুড গভর্ননেন্স'-এর প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেন। এদিনের মুখ্য বক্তা শ্রী বালা সুব্রহ্মণ্যম বিচারবিভাগ, আইন বিভাগের মহিলাদের উপস্থিতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে এই ক্ষেত্রে তাদের আরোও এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, পূরবী সাহা দাস, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুব্রহ্মণ্যম, প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মহিলাদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী ধীশ্বরী নাগ।

শোকসংবাদ

মালদা জেলা প্রচারক মলয় দত্তের কাকা নয়নকৃষ্ণ দত্ত গত ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বীরভূমের সিউড়ির হাটজন বাজার নিবাসী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। স্ত্রী, দুই পুত্র ও বহু গুণমুগ্ধ স্বয়ংসেবক বন্ধু-পরিজন তিনি রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্কপ্রমুখ গণেশচন্দ্র পালের মাতৃদেবী সন্ধ্যারাণী পাল গত ২৪ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কেশবপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সংস্কার ভারতীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা

রাইকৃষ্ণ পদাবলী

বিকাশ ভট্টাচার্য

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন দুনিয়া জুড়েই ভালবাসার প্রকৃত অর্থ এবং গুরুত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে। জীবনের সকল স্তরেই আবেগটা একেবারে কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। একটা সম্পর্ক, তা যেমনই হোক না কেন, তার সৌন্দর্য, ঐশ্বরিকতা এবং বিশুদ্ধতা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবন এবং অস্তিত্বের প্রয়োজনেই মানুষ, প্রেম প্রত্যাশা করে। তার প্রয়োজন ধৈর্য এবং ত্যাগের দৃশ্যমান অভিব্যক্তি।

সংস্কার ভারতীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'রাইকৃষ্ণ পদাবলী' রবীন্দ্র-নৃত্যশৈলী ও কীর্তনের মিশ্রণে এক বিশিষ্ট আঙ্গিকের নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অপূর্ব কোলাজ। সম্প্রতি ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র (ই জেড সি সি) আয়োজিত মাসাধিককাল ব্যাপী থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে নৃত্যনাট্যটি দেখা গেল। ভারতের চিরন্তন এই প্রেমকাহিনি প্রকৃতপক্ষেই সর্বোচ্চ গুণমানসম্পন্ন এক লোকজ উপখ্যান। আর রাধাকৃষ্ণের এই অপূর্ব প্রেমকাহিনি কাব্যে রূপ পেয়েছে কবি জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবির হাত ধরে। মধ্যযুগের অনেক মুসলমান কবিও সে সময়ে তাঁদের রচিত পদে রাধা-কৃষ্ণকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরি বাংলাদেশের কবি শেখ হাফিজুর রহমান রচনা করেছেন এই 'রাইকৃষ্ণ পদাবলী'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'রই যেন এক সাম্প্রতিক রূপ। এটি মূলত কাব্যনাট্য। এতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং ভানুসিংহের বহু পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

এই সম্পূর্ণ কাব্যনাট্যে সুরসংযোজন করেছেন 'সাতকাহন' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের রত্না চৌধুরী। এ এক অসামান্য কাজ। ভানুসিংহের পদাবলীর তিনটি পদ এখানে আছে যেগুলি কবিগুরুর সুর করা অবস্থায় পাওয়া যায়নি। শ্রীমতি চৌধুরী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেগুলিতে সুর দিয়েছেন। গানগুলি রবীন্দ্রছায়া থেকে এতটুকু সরেনি। এর মধ্যে 'শ্যামরে নিপট কঠিন মন তোর' গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জয়তি চক্রবর্তী। 'শুন সখী বাজই বাঁশিতে' গেয়েছেন ইন্দ্রাণী সেন। রাধার সমস্ত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা। শিল্পী যেন সম্পূর্ণভাবে শ্রীরাধার প্রেম, বিরহ, আত্মত্যাগ ও অভিমানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গানগুলি গেয়েছেন। শেখ হাফিজুর রহমান লিখেছেন অপূর্ব। তিনি বলেছেন— 'এ যেন এক চৈতন্যময় সন্ন্যাসীর কাছে তার নম্র উত্তরসাধকের সবিনয় সমর্পণ।' অন্য আরও যাঁরা এই নৃত্য-গীতিনাট্যে কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, মনোময় ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য।

'রাইকৃষ্ণ পদাবলী'র আরও একটি সম্পদ-এর ভাষ্য পাঠ ও বাচিক অভিনয়। সঙ্গীতের মতো এখানেও পেশাদার শিল্পীদের নেওয়া হয়েছে। প্রথমেই নাম করতে হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর অনুপম কণ্ঠ ও বাচিক অভিনয় নৃত্যনাট্যটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। এছাড়া প্রদীপ ঘোষ, ব্রততী

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশীষ বসুও অনবদ্য। শ্রাব্য অংশের সবটুকুই প্রি-রেকর্ডেড।

পেশাদারি শিল্পীদের পাশে নৃত্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছে সংস্কার ভারতীর সিউড়ি শাখার সদস্য-সদস্যারা। নৃত্য পরিচালনায় মৌমিতা সেনগুপ্ত বিষ্ণু তাঁর স্বকীয়তাকে রূপ দিয়েছেন। শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ তাঁর অনবদ্য নৃত্যশৈলীতে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় দেবস্মিতা চক্রবর্তী, সুবল সখা মুনমুন রুজ এবং ললিতা-বিশাখার চরিত্রে মধুবন্তী রায় ও নীতশ্রী মুখার্জী অনবদ্য। পেশাদারদের পাশে এইসব অপেশাদার এবং বয়োকনিষ্ঠ নৃত্যশিল্পীরা কিছু কম যাননি। সহকারী নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন মধুবন্তী রায় ও অর্পিতা সামন্ত। মঞ্চ নির্মাণে সায়ন্তন ঘোষ, তমালকৃষ্ণ দাস, তীর্থশঙ্কর পরামানিক। শব্দ প্রক্ষেপণে শ্যামল মণ্ডল, আলোক সম্পাতে বিশ্বনাথ বিশ্বাস যথাযথ। সামগ্রিক পরিকল্পনায় ছিলেন তিলক সেনগুপ্ত। এই প্রযোজনায় সাহায্য করেছেন ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় ও সাতকাহন। পরিশেষে শেখ হাফিজুর রহমানের একটি পদ, শ্রীরাধার তীব্র বেদনার মুহূর্তে :

এই বন বিথীকায়, ধীরে, অতি ধীরে,
স্মরণের বালুচরে, নিত্য অবিরত,
একাকী তাঁকে যে আমি করিব স্মরণ,
যার কারণেতে আমি ছেড়েছি স্বজন।
বিশাল এই নির্জনের, নির্জনতা ঘেরি,
রচে রচে চলে যাবো, জীবন অবধি।
হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব। ■

শব্দরূপ-৭৬৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

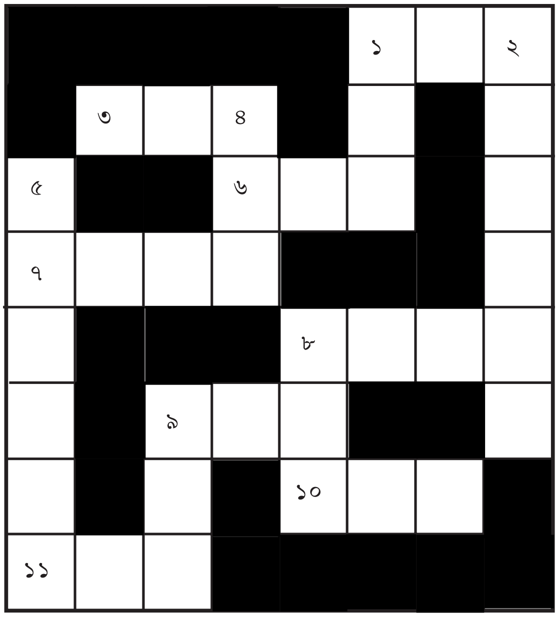

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পুরাণপাঠক; বক্তা, **৩.** কলার ভেলা, **৬.** চিঁড়া দই দুধ মিষ্টান্ন ফল ইত্যাদি আহার; ভাত ছাড়া অন্য নিরামিষ দ্রব্য আহার, **৭.** বাণভট্ট-প্রণীত কথাগ্রন্থ বিশেষ, **৮.** শিশু, নাবালক, **৯.** পৌরাণিক রাজা বিশেষ যিনি ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হলে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় শূন্যে স্থাপিত হয়েছিলেন, **১০.** রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

উপর-নীচ : ১. নানাবর্ণ বিশিষ্ট রাক্ষস, **২.** সাহিত্য সম্রাট-এর কালজয়ী সৃষ্টি, **৪.** পুঁটিমাছ, **৫.** বাগ্‌ধারায় অলীক কল্পনা, অবাস্তব ভাবনা, **৮.** হস্তিতাড়ন দণ্ড, **৯.** বহেড়া, হরিতকী, আমলকী একসঙ্গে।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬১
সঠিক উত্তরদাতা
মনোরঞ্জন ভক্ত
পাকুয়া, মালদা
শিবেশ্বর সরদার
গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পা			অ	প	ঘা	ত	
দ			ক্রূ		ত		
প	রা	শ	র		স		
	জ্য			অ	হ	ম	
	শ্রী	ধ	র			ল্লি	
		রা		স	ত্য	কা	ম
		বাঁ		বু			ধ্য
	ক্রো	ধা	গা	র			মা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৬৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৫

ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২২

প্রকাশিত হচ্ছে ৬ই অক্টোবর, ২০১৫

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত — নৈরাজ্য (রহস্য উপন্যাস)

সুমিত্রা ঘোষ — তোরা কোন গগনের তারা? (সামাজিক উপন্যাস)

প্রবন্ধ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রসিত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য, অমলেশ মিশ্র, দেবব্রত ঘোষ, রমেশ পতঙ্গে, নবকুমার ভট্টাচার্য, বরুণ দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত রায়।

বড় গল্প

গোপালকৃষ্ণ রায়— জরায়ুর যন্ত্রণা

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এষা দে, গোপাল চক্রবর্তী, গার্গী দেব, সিদ্ধার্থ সিংহ, চন্দ্রাণী সাধুখাঁ, সমর মিত্র।

বিচিত্র রচনা

পিনাকপাণি ঘোষ — চিঠি মিঠি, অর্ণব নাগ — সেকালের মেসবাড়ি, তাপস অধিকারী — পশুপাখির মাতৃস্নেহ।

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — কলকাতায় প্রথম নিবেদিতা

পুরাণকথা

বিজয় আঢ্য — এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা

ভ্রমণ

সুভাষ বিশ্বাস— রথ উৎসবে হাম্পি

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিষ্ণুপুরের দশাবতরী তাস

বিনোদন

বিকাশ ভট্টাচার্য— বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত

এছাড়াও থাকছে ছোটদের জন্য **নবাঙ্কুর**—

বিরাজ রায়— ইচ্ছে

মূল্য : ৭০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
28 September - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা